উপনিষদের আলো

শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার
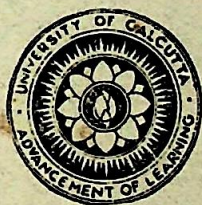
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪৯

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে

শ্রীউমাশংকর সরকার

উপনিষদের আলো প্রকাশিত হল। এতে উপনিষদের সার কথাগুলি সহজ ও সরলভাবে বলবার চেষ্টা করেছি। তত্ত্ব গভীর, বাংলা ভাষায় এর আলোচনাকে সুখকর কর্‌তে চেয়েছি।

বইটি লিখ্‌তে বসে আমি আমার ছাত্র শ্রীমান্‌ দেবীপ্রসাদ ও শ্রীমান্‌ অরবিন্দের অনেক সাহায্য পেয়েছি। শ্রীমান্‌ দেবীপ্রসাদ বইখানিকে সুন্দর ও সহজ করবার জন্য খুব পরিশ্রম করেছে। কল্যাণভাজন শ্রীমান্‌ হরিদাস রায়, শ্রীমান্‌ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও মহম্মদ রকিবও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাদের আন্তরিক স্নেহ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ দিয়ে তাদের আন্তরিকতার অমর্য্যাদা করতে চাই নে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় আমার এ বইয়ের নামকরণ করে দিয়েছেন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন উপাধ্যক্ষ মহোদয় এ বইটি লিখবার জন্য আহ্বান করে' ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত করে' আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। তিনি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করতে আগ্রহান্বিত। বাঙ্গালী মাত্রই তাঁর সেবাকে চিরকাল কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করবে। ইতি

'শারদ পূর্ণিমা'
কলিকাতা
১৩৪৫ সাল

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণ

"উপনিষদের আলো"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। অল্প সময়েই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়েছে। এ সংস্করণ কিছু পরিবর্দ্ধিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রুফ দেখবার ভার আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী শ্রীমতী অরুণা সিংহ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা ও স্নেহ জানাচ্ছি।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা
কলিকাতা
১৩৪৭ সাল

গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণ

"উপনিষদের আলো"র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। এই সংস্করণে কিছু নূতন বিষয় দেওয়া হল।

এ সংস্করণ প্রকাশিত হ'তে বিলম্ব হল, কারণ দেশের অবস্থা ও বিশৃঙ্খলা। বহু পূর্ব্বেই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান উপাধ্যক্ষকে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর যত্ন ও আগ্রহেই এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হল।

বৈশাখী পূর্ণিমা
কলিকাতা
১৩৫৬ সাল

গ্রন্থকার

বিষয় ও শব্দ-সূচী

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদের আলো

অবতরণিকা

ভারতের অধ্যাত্ম শাস্ত্রের ভেতর উপনিষদের মত পুস্তক বিরল। ভারতের কেন, সমস্ত জগতের অধ্যাত্ম-ভাণ্ডারে এমন অলৌকিক জ্ঞানপূর্ণ অবদান আর দেখতে পাই নে। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে এতে কখন কবিত্বে, কখন কথোপকথনে, কখন বিচারে, যেমন সরল অথচ গভীর, আনন্দদায়ক অথচ জ্ঞানপ্রদ উপদেশ আছে, অন্য কোথাও তা আছে কি না সন্দেহ। উপনিষদের আলোচনায় কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে, সর্ব্বত্রই মনীষীরা পেয়েছেন জ্ঞান ও অধ্যাত্ম-প্রসাদ।

ব্রহ্মবিদ্যা ভারতের অতুলনীয় সম্পদ। এই ব্রহ্মবিদ্যার আকর উপনিষদ। আচার্য্যেরা উপনিষদকে অবলম্বন করে ব্রহ্মবাদ স্থাপিত করেছেন। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র উপনিষদের বাক্যকে নিয়েই। আচার্য্য শঙ্কর লিখেছেন,

এই সূত্রগুলি বেদান্ত-বাক্যের পুষ্পস্তবক। উপনিষদের এমন গাম্ভীর্য্য ও সারবত্তা যে পরবর্ত্তী আচার্য্যেরা এরই তত্ত্বানুসন্ধানে দর্শন শাস্ত্র রচনা করেছেন।

উপনিষদ মন্ত্রের এত প্রতিষ্ঠা কেন? শঙ্কর, রামানুজ, বল্লভ প্রভৃতি আচার্য্যেরা উপনিষদ-বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন। ঔপনিষদ তত্ত্ব উদ্ভাসিত করবার জন্যে তাঁদের মনীষাকে প্রয়োগ করেছেন। শুধু এদেশের চিন্তা ও অনুভূতির ধারাকেই উপনিষদ প্রেরণা দেয়নি, পাশ্চাত্যের মনীষীরাও এর প্রেরণা পেয়েছেন। প্লটিনাসের মধ্যে পাই উপনিষদের স্পষ্ট ছায়া। তারপর সোপেনহার, এমারসন্, দয়সন্, উপনিষদের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। পাশ্চাত্যে অধ্যাত্মানুভূতির গভীরতা এসেছে উপনিষদের আলো পাবার পর থেকেই। তত্ত্ব একজাতির বা এক দেশের বিশিষ্ট সম্পদ না হলেও, এ কথা মান্‌তে হবে যে বিভিন্ন মানুষের বা জাতির ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় হলে মনের দ্বার খুলে যায়। উপনিষদের গভীরতা, প্রবীণতা ও শালীনতা দেখে মনে হয় যে উপনিষদ অধ্যাত্ম-বিদ্যার চির-আশ্রয়।

উপনিষদের সত্য চিরন্তন সত্য। ভারতের চিন্তাধারায় প্রাচীন আচার্য্যদের উপনিষদ অবলম্বন; একালের আচার্য্যদেরও অবলম্বন উপনিষদ। রাজা রামমোহন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনার ভিত্তি ছিল উপনিষদ। বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার

মূল উৎস উপনিষদে। রবীন্দ্রনাথ একবার আমাকে লিখেছিলেন, "উপনিষদের তত্ত্বকে আমি জীবনের সাধনা বলে গ্রহণ করেছি।" শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগসাধনার প্রথম সন্ধান পেয়েছেন ঈশা উপনিষদে। উপনিষদে অধ্যাত্ম জীবনের এমন সার তত্ত্ব নিহিত আছে যা আজও ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে আর ব্রহ্মানুভূতির তৎপরতায় উদ্বোধিত করে। সেখানে অধ্যাত্ম জীবনের চরম পরিণতি। পরবর্ত্তী যুগের সমস্ত ভারতীয় আদর্শগুলি উপনিষদে সূত্রাকারে আছে। কি জ্ঞানবাদ, কি ভক্তিবাদ, কি অধ্যাত্মযোগ, উপনিষদে সব পথগুলির নির্দ্দেশ দেখিতে পাই। হিন্দুর সকল চিন্তাধারাই যেন উপনিষদের ব্যাখ্যা। তত্ত্ব-গবেষণায় অনেক নতুন তথ্যের উদ্বোধন হলেও, সিদ্ধান্তের দৃষ্টি উপনিষদকে অতিক্রম করতে পারেনি। তার কারণ মানুষের দিব্য প্রেরণার ও চেতনার উন্মুক্ত গতি উপনিষদে যেমন প্রকাশ পেয়েছে, আর কোথাও তেমন পায়নি। অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশ পথ অতি সূক্ষ্ম। সেখানে বিচার বিতর্কের চেয়ে আবশ্যক হচ্ছে অন্তঃবেদনার জাগরণ,—অনুভূতির সূক্ষ্মতায়, বিজ্ঞানের দিব্য দ্যোতনায়। তত্ত্ব বিচার বুদ্ধিকে নিয়মিত করে, কিন্তু বিজ্ঞানের ধারা স্বচ্ছ না হলে মানুষ দিব্য জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে না। উপনিষদের প্রত্যেকটি মন্ত্র প্রসাদগুণে ও ভাব-গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ—এর শক্তি ও দীপ্তি মানুষকে মহিমময় সত্তার বোধে পূর্ণ করে। সরল ও সহজ কথায় এত গভীর তত্ত্বের সংবেদন আর কোথাও দেখি নে।

উপনিষদকে বলা হয় আরণ্যক। অরণ্যের গভীর শান্তির ভেতর ধ্যানলোকে তত্ত্বের প্রকাশ। উর্দ্ধমানস স্তর থেকে অবতরণ করে অমল জ্যোতি, এই জ্যোতি দেয় অধ্যাত্ম সত্যের দৃষ্টি। সত্য নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত; বিশ্বশক্তি ও বিশ্ব প্রাণের সূত্র এই সত্যেই বিধৃত। ধ্যানের গভীরতায় চিত্তের বৃত্তিগুলির উন্মীলন, বিশ্ব-বিকশিত চেতনার সঙ্গে অন্তরের যোগ। যোগ দেয় সত্যের উদ্দীপ্তি।

সত্য অন্তঃচেতনাতে নিহিত, তার উদ্ধার করতে হয় অন্তঃচেতনায় সমাহিত হয়ে। অন্তঃচেতনা দিব্য-চেতনার সঙ্গে নিত্যযুক্ত। দিব্য-চেতনা হতে অবতরণ করে সত্যের মহিমা, জ্ঞানের অরুণালোক, আনন্দের সংবাদ। এত সত্যের ভাবনা নয়, সম্যক দৃষ্টি। ভাবনার গভীরতা দেয় শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা সত্যের বিধৃতি। ধারণ-সামর্থ্য প্রতিষ্ঠিত হলে হয় জীবন সত্যের প্রতিষ্ঠা। উপনিষদ সত্যকে শুধু নির্ণয় করেনি। সত্যকে ধারণ করেছে প্রজ্ঞালোকে। উর্দ্ধ চেতনার সত্তায় জেগে উঠে উপনিষদের তত্ত্ববোধ। প্রসাদগুণে উপনিষদ অতুলনীয়।

সংখ্যায় উপনিষদ হচ্ছে একশো আট। একশো আটের বদলে কেউ একশো বারও বলেন। সব উপনিষদই অবশ্য সমান প্রামাণ্য নয়। তবে ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মাণ্ডুক্য, মণ্ডুক, ঐতরীয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, এই দশটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

উপনিষদের শ্রেণী বিভাগ করা অসম্ভব নয়। তত্ত্বের গভীরতায় এবং ভাষার তারতম্যে বৃহদারণ্যক্, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয় ঐতরীয়, ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য এইগুলিই প্রধান। কিন্তু এদের ভেতরও ভাষা ও ভাবের গাম্ভীর্য্যে বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঈশা, কেন, কঠ, মণ্ডুক প্রথম শ্রেণীর।

বিষয়-বস্তুর দিক দিয়েও উপনিষদের বিভাগ নির্ণয় করা যেতে পারে। সব উপনিষদেরই বিষয় এক নয়। বিশেষতঃ পরের যুগে উপনিষদগুলির ভাষা ও বিষয় প্রথম যুগের উপনিষদগুলি থেকে ভিন্ন। শুধু একরকম ব্রহ্মবিদ্যাই সব উপনিষদ শিক্ষা দিয়েছে, একথা বলা দুঃসাহসের পরিচয়। তাই জীব-গোস্বামী পাদ তাঁর ষট্সন্দর্ভ গ্রন্থে উপনিষদগুলিকে ব্রহ্মতত্ত্বপর ও ভাগবততত্ত্বপর বলে নির্দ্দেশ করেছেন। বৃহদারণ্যকে বা মাণ্ডুক্যে ব্রহ্ম তত্ত্বের মীমাংসা আছে ; কতকগুলি উপনিষদ যোগতত্ত্ব নিরূপণ করেছে, যেমন তেজবিন্দু, নাদবিন্দু, ধ্যানবিন্দু। অবশ্য একথা খুবই সত্যি যে প্রত্যেক উপনিষদে আছে জ্ঞানের কথা, অনুশাসনের কথা। তবুও কতকগুলিতে তত্ত্বের মীমাংসার চেয়ে কবিতার ও ছন্দের ভেতর দিয়ে তত্ত্বের প্রকাশই আছে বেশী। অনেকগুলিতে—বিশেষতঃ ঈশা, কেন, কঠ, শ্বেতাশ্বতরে—আছে অনুপম কবিত্ব। সত্য যখন প্রত্যক্ষ হয় তখন তার প্রকাশ হয় ছন্দে ; সত্যবোধ অনুপ্রাণিত করে সমস্ত জীবনকে। ছন্দের ভেতর দিয়ে অবতরণ করে সত্যের দীপ্তি। এই দীপ্তি বুদ্ধিকে

অবলম্বন করে জীবনকে অনুপ্রাণিত করে তত্ত্বে। সত্যের স্বাভাবিক ভাষা ছন্দ।

সত্য ও ছন্দ

তত্ত্ববোধের সঙ্গে ছন্দের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। ছন্দোময় জীবন সত্যের বিধৃতি। জীবন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হলে তার সমস্তটাই ছন্দোবদ্ধ হয়। অরূপ সত্যের মূর্ত্ত প্রকাশ ছন্দ। সত্য "নিজের মহিমায় স্থিত"—প্রজ্ঞানঘন, আনন্দঘন।

উপনিষদ তত্ত্বালোচনায় প্রায়ই ছন্দের কথাটি ভুলে যাই। এক শান্তি মন্ত্রে উপনিষদের পাঠ আরম্ভ, আর এক মন্ত্রে সে পাঠ শেষ। এর কারণ সুগভীর। মন্ত্র-ছন্দের সঙ্গে চিত্ত-স্বাচ্ছন্দ্যের নিকট সম্বন্ধ। ছন্দ চিত্তে ব্যাপকবোধ জাগিয়ে তোলে ও সত্যকে ধারণ করবার সামর্থ্য দেয়। ছন্দের সুকোমল আঘাতে গভীর অনুভূতির দ্বার খুলে যায়। সমস্ত জীবনই তখন পল্লবিত হয়ে ওঠে নবীনভাবে। সত্যবোধ যতদিন না সমস্ত জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তাকে দিব্য করে না তোলে, ততদিন সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। সত্য বোধই দেয় সত্য প্রতিষ্ঠা। সত্য প্রতিষ্ঠা পরম কাম্য। এতে জীবনের পার্থিব ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে যায়। সত্যের ছন্দ যখন জীবনের ভেতর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সত্তার সব স্তর উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তখন সত্যের বিরাট-রূপের পরিচয়।

বিশ্ববিকশিত জীবনের দিব্য মূর্চ্ছনার ভেতর দিয়ে পরিচিত হই সত্যের কল্যাণ মূর্ত্তির সঙ্গে।

ছন্দের নানা রূপ। সত্যের ছন্দ আছে, সুন্দরের ছন্দ আছে, জ্ঞানের ছন্দ আছে, আনন্দের ছন্দ আছে। কিন্তু সকলের ভেতর দিয়ে স্ফুট হয় সত্যের দ্যোতনা ; ছন্দ ত সত্যের অনন্ত প্রকাশভঙ্গী। জীবনের অনুভূতি যেখানে যত গভীর, ছন্দও সেখানে তত উদার ও বিকাশশীল। ছন্দ অনুভূতির রূপ। উপনিষদের তত্ত্ব যেমন গভীর, এর ছন্দও তেমনি গম্ভীর। প্রত্যেক মন্ত্রটির, প্রত্যেক শ্রুতিটির, ছন্দ-বিন্যাস অনন্ত সঙ্গতি-সম্পন্ন। তাই ভাবের ও ভাষার ঐশ্বর্য্যে উপনিষদ পূর্ণ।

স্বাধ্যায় সম্পন্ন হয়ে বেদপাঠে প্রবেশ করতে হত। মন্ত্রের ছন্দোবদ্ধ উচ্চারণই স্বাধ্যায়। স্বাধ্যায়ের ভেতর দিয়ে প্রত্যেক শব্দটির শক্তির প্রকাশ। বেদমন্ত্র শুধু শব্দযোজনা নয়, এতে আছে স্বরের অভিব্যঞ্জনা—প্রতি স্বরভঙ্গী ভাবের দ্যোতনায় ভরা। বাক্য অর্থ প্রকাশ করে, স্বর ও ধ্বনি ভাবের স্ফুরণ করে। বাক্যের অর্থ আছে, স্বরেরও অর্থ আছে, কিন্তু সে অর্থ এত সূক্ষ্ম যে স্বরতরঙ্গ যতক্ষণ না মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, ততক্ষণ ধ্বনি ও স্বরের দ্যোতনা চিত্তে স্ফুর্ত্ত হয় না।

মানুষের অনুভূতি ছন্দের সূক্ষ্মতররূপ গ্রহণ করে। সূক্ষ্মের ভেতর পাই জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ। এই সূক্ষ্মের ধারণাকে উজ্জ্বল করবার জন্যই ছন্দের প্রয়োগ। শব্দের ভেতর ধৃত হয়ে

থাকে জ্ঞানের অপার্থিব রূপ, সে রূপ আমাদের মানস প্রত্যক্ষের কাছে ধরা পড়ে না। অতিমানসের কাছে তা সুস্পষ্ট। তাই ছন্দের সূক্ষ্ম রূপের সঙ্গে তত্ত্বের নিত্য সম্বন্ধ। তাকে প্রত্যক্ষ করি অতি-মানসচেতনার স্তরে। এই স্তরে চেতনাকে উন্নীত করবার কৌশল হল মন্ত্র। উপনিষদ নিতে চেয়েছে চেতনাকে ঊর্দ্ধ হতে আরো ঊর্দ্ধতর স্তরে, যেখানে চেতনা স্বয়ং অধিষ্ঠিত, নাম রূপ ক্রিয়া (world of appearance) থেকে স্বয়ং উন্মুক্ত। মুক্ত চেতনাই উপনিষদের লক্ষ্য। কিন্তু চেতনার এরূপ অবস্থিতি জ্ঞানের কাছে ধরা পড়ে না। মন্ত্রদ্বারা অন্তঃকরণকে এমন সূক্ষ্ম অবস্থায় ও সূক্ষ্মানুভূতিতে নিয়ে যেতে পারি, সত্যের যেখানে পরিচয়।

উপনিষদ বিচারশাস্ত্র নয়, সত্যদৃষ্টি। তাই তার অনুশীলনে দরকার আছে বিশ্বের কল্যাণরূপের নিবিড় পরিচয়। বিচার যত দৃঢ় হোক না কেন, চিত্ত স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ না হলে সত্যানুভূতির পথ খোলে না। এ জন্যে চাই জীবনের ভেতর কল্যাণস্পৃহা ও কল্যাণদৃষ্টির প্রেরণা। সত্যানুভূতি স্বভাবতই মানুষের পক্ষে সুকঠিন, কারণ সত্তার সব স্তর হতে কল্যাণস্পৃহা মূর্ত্ত হয়ে ওঠে না। প্রাণ, মন, চিত্ত কল্যাণস্পৃহায় পূর্ণ হলে দিব্য জীবনের ছন্দে সত্তা ভরে ওঠে; তখন জড়তা, চাঞ্চল্য, সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়, পরিচয় হয় অতিমানসানুভূতির। উপনিষদের তত্ত্ব বোঝার যোগ্যতা তখনই লাভ করি। উপনিষদের তত্ত্বাবধারণ করতে হয় ধ্যানের প্রশান্তিতে, সেখানে চিত্তের অধিকার অবসিত।

প্রাণের কম্পন স্থির না হলে, মন ভাবনাশূন্য না হলে, সত্যসাধনা সিদ্ধ হয় না। বিষয় সংস্পর্শ থেকে মন ও প্রাণ মুক্ত না হলে ব্রহ্মানুভূতির দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। প্রাণ ও মন ছন্দায়িত হলে বিজ্ঞান ও আনন্দের সঙ্গে পরিচিত হই। ধ্যান নিয়ে যায় উন্মুক্ত, মহিমান্বিত সত্যের দিকে।

উপনিষদের আলোচ্য বিষয়

উপনিষদের দুটো দিক: একটা তত্ত্বের দিক, আর একটা সাধনার দিক। দুটোই প্রধান। তত্ত্বের সন্ধান সাধনার দিকে আকৃষ্ট করে। সাধনা দেয় অন্তর্দৃষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্য, যার ভেতর দিয়ে শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম বোধের উন্মেষ। ধ্যানস্নাত ও ধ্যানমগ্ন হয়ে তত্ত্ব আহরণ করতে হয়। কল্লোলহীন চিত্ত সত্য প্রকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র।

উপনিষদকে বলে জ্ঞানশাস্ত্র। এখানে চরম তত্ত্বের নির্ণয় দেখতে পাই। উপনিষদের ঋষিরা চেয়েছিলেন জীবচেতনা ও ব্রহ্মচেতনার একত্ব প্রতিপন্ন করতে। জ্ঞানের দৃষ্টিতে এই হল পরম পুরুষার্থ। দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা এ কথা স্বীকার করেন না*। তাঁরা বলেন জীব ও ব্রহ্মে ভেদ আছে

* উপনিষদকে অবলম্বন করে চিন্তার মোটামুটি দুটি ধারা এদেশের দর্শনের ভেতর প্রবেশ করেছে। একটি অদ্বৈতবাদ, অন্যটি দ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদের নানারূপ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, ভেদা-ভেদবাদ ইত্যাদি। এইগুলি অবশ্য একটি বিষয়ে একমত। তারা নির্বিশেষ অদ্বৈতবিরোধী।

—ব্রহ্ম এক, বহুকে নিয়েই, বহুকে বাদ দিয়ে নয়। মানুষ যখন পরম সত্তাকে ধ্যানের ভেতর দিয়ে লাভ করে তখন তাকে বিশ্বগরূপে পেয়েও বিশ্বাতীতরূপে পেতে চায়।

এ কথা ঠিক, যদিও প্রাচীনেরা তা স্বীকার করতেন না যে, সব উপনিষদে একই তত্ত্ব নির্ণীত হয়নি। এমন সব উপনিষদ আছে, যেখানে অদ্বৈতবাদ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। এমন উপনিষদও আছে যেখানে শুধু উপাসনার কথা, সেখানে রাম, গোপাল বা নৃসিংহকে বলা হয়েছে পরমতত্ত্ব। কতকগুলিতে কর্ম্মপূর্ব্বক উপাসনার কথা—হয়ত তত্ত্বের কথা আছে মাত্র একটি মন্ত্রে। এই জন্যেই দার্শনিকেরা বুদ্ধির কৌশলে উপনিষদগুলিকে নিজেদের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য শুধু উপনিষদের মন্ত্রগুলির আলোচনায় একটি স্থির সিদ্ধান্ত পাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়।

উপনিষদের রহস্য শুধু দার্শনিক বিচার দিয়ে বোঝা যায় না, কারণ দর্শনতত্ত্বের আলোচনা করে মননের দ্বারা। বিচারের একটি রূপ আছে, সে রূপকে সে অতিক্রম করতে পারে না। বুদ্ধি বিচার করে, কিন্তু তার পেছনে থাকে অনুভূতি। অনুভূতির রূপকে অবলম্বন করে বিচারপ্রণালী প্রস্তুত হয়। উপনিষদ ছন্দের দ্বারা অনুভূতির স্তরবিশেষকে প্রস্ফুটিত করে। ক্রমোচ্চ স্তরে আরোহণ করবার উপায় এতে আছে। এই অতিমানসচেতনার যে স্তর যাঁর কাছে বিকশিত, তিনি সেই স্তরের দৃষ্টিকে অবলম্বন করে বিচার প্রণালী রচনা

করেন। বিচার দেয় বুদ্ধির উৎকর্ষ, অনুভূতি দেয় তত্ত্বের সংবাদ। এইজন্যে উপনিষদে অপরা ও পরা বিদ্যার ভেদ করা হয়েছে। পরাবিদ্যা সম্পূর্ণ বিচারমূলক নয়, অনুভূতি-মূলক।

উপনিষদ শুধু ব্রহ্মবিচারে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। উপাসনায় ও ধ্যানের ভেতর দিয়ে স্বরূপের বিকাশই এর লক্ষ্য, যদিও এই বিকাশের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার আগেই নানা অলৌকিক রহস্যের সঙ্গে পরিচয়। চেতনার পূর্ণ জাগরণ ও চেতনায় অবস্থিতি এই বিদ্যার চরম ফল। পূর্ণভাবে চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বে অন্তরের সমতা ও শুদ্ধি ব্যাপক চেতনার পরিচয় দেয়। ব্যাপকবোধের প্রতিষ্ঠা উচ্চস্তরে উপনীত হবার যোগ্যতা দেয়। এই জন্যেই উপনিষদে সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার পরেই নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা। সগুণে প্রতিষ্ঠিত হলে এমন অবস্থা আর এমন শক্তি পাই যে নির্গুণকে আয়ত্ত করা সহজ হয়।

আচার্য্য শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা এদেশে প্রাধান্যলাভ করেছে। সগুণ ব্রহ্মবিদ্যা সম্পন্ন হলে যে ধৃতি ও শক্তি অর্জ্জিত হয়, তার দিকে তত অবহিত নই। মায়াময় বিশ্ব, এই মতবাদে উপাসনার স্থান থাকলেও তত্ত্ববোধে তার স্থান নেই। উপাসনা বুদ্ধি স্বচ্ছ করে, কিন্তু অজ্ঞানকে নাশ করে না। ফল হয়েছে, তত্ত্বসম্পন্ন হবার জন্যে সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে অল্পই পরিচিত হচ্ছি। তত্ত্বজিজ্ঞাসায় দরকার অন্তরের নির্ম্মলতা। তত্ত্ববিচার দেয় সত্যবোধ। কিন্তু এর জন্যে চাই

বুদ্ধির একাগ্রতা ও ঔজ্জ্বল্য। উপাসনা দুইটি দেয়। নির্ম্মল না হলে বিচারসম্পন্ন হয়েও ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়া যায় না। সগুণ ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর দীপ্ত করে তোলে, অভয়ে প্রতিষ্ঠা করে। চিত্তের সূক্ষ্ম পরিণাম প্রকাশ করে অদৃশ্য ও অলৌকিক জগৎ। উপনিষদ-বিদ্যার গাম্ভীর্য্য এই জন্যেই এত বেশী।

উপনিষদের উপাসনা শুধু দেবতার ধ্যান নয়। এ হচ্ছে নিশ্চিতভাবে ব্রহ্ম-চেতানার জাগরণ এবং তাতে অবস্থিতি। ধ্যান আমাদের চেতনাকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয়, বিরাট চেতনার প্রকাশ করে। উপাসনা দেয় চৈতন্যের যথার্থ জাগরণ। মানুষের সত্তার একটি স্বাভাবিকী বৃত্তি আছে আনন্দানুভূতির দিকে। এই হল মানুষের প্রকৃত রূপ। তাই মানুষ প্রকৃতির শত প্রেরণায় তৃপ্ত হতে পারে না। সে চেয়েছে একটা অনাবৃত সত্তার অনুভূতি। এতেই তার পরম তৃপ্তি। কর্ম্মানুযায়ী মানুষের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। কর্ম্ম দেশকালে কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধিকে নিয়ে প্রকাশিত হয়। মানুষ ব্যক্তিত্বে উদ্বোধিত হয়ে কর্ম্ম-সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়। উপনিষদ মুক্তি দেয় এই কর্ম্মগ্রন্থি থেকে।

কর্ম্ম-মীমাংসা

মানুষের কর্ম্মপ্রেরণা তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কর্ম্মের ভেতর দিয়ে মানুষ চেয়েছে তার ভোগবাসনার তৃপ্তি। বাসনা

মানুষকে চালিত করে নবীন সৃষ্টির পথে, তাকে দেয় ভোগ সম্ভার। কর্ম্মের ভেতর দিয়ে মানুষ যে মানুষী বৃত্তিই উপভোগ করে, তা নয়, সে দিব্য বিত্তও ভোগ করতে পারে। এই দিব্য ভোগের জন্যই কর্ম্ম-মীমাংসার সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ কর্ম্ম ও শাস্ত্রীয় কর্ম্মের মধ্যে ভেদ আছে। সাধারণ কর্ম্মে এমন কোন অপূর্ব্বতা নেই যা তাকে দিব্যসম্পদ দিতে :পারে। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সূক্ষ্ম ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে একটা শক্তি উদ্বোধিত করে যাতে মানুষ হয় দিব্য ভোগের অধিকারী। কর্ম্ম-মীমাংসা উচিত অনুচিতের সন্ধান দেয়, কিন্তু কর্ম্মপ্রেরণা স্থূলভোগকে অবলম্বন করে উদ্বোধিত হয় না। তার ভেতর থাকে সূক্ষ্মভোগের বীজ ও শক্তি। ভাবনার সূক্ষ্মতা দেয় ভোগের সূক্ষ্মতা। এই সূক্ষ্ম-ভোগ সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই উদাসীন। তার কারণ সূক্ষ্ম-ভোগ করবার শক্তির উৎপত্তি সূক্ষ্মানুভূতি থেকে। কর্ম্ম-মীমাংসা যে পার্থিব জীবনের ভোগকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে তা নয়। তার ভেতর আছে একটা সূক্ষ্মতর জীবনের সাড়া আর সূক্ষ্মতর বোধের সঞ্চরণ। এই বোধ ও সাড়াকে অবলম্বন করেই স্বর্গের কল্পনা। একে কিন্তু কল্পনা বলে ত্যাগ করলে চলবে না। মানুষের অন্তঃকরণ যখন ভাবনায় ও মন্ত্রাদিতে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, তখন তার কাছে জেগে ওঠে এক সূক্ষ্ম জগতের জীবন-লহরী ও তার ভোগ-বৈচিত্র্য। সাধারণত কর্ম্মের সম্বন্ধ ইহলোকের সঙ্গে, প্রাণস্তরের তৃপ্তির সঙ্গে, কারণ কর্ম্ম জীবকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত এবং আমাদের জীবত্বের সাড়া প্রাণস্পন্দনে প্রকাশিত। প্রাণের আরাম, প্রাণের পুষ্টি, প্রাণের গতিই জীবত্বের

প্রথম নিদর্শন, বিশেষত স্থষ্টির স্তরে। ক্রমবিকাশের স্তরে মানুষ এখনও জীব জগত থেকে উঁচুতে উঠতে পারেনি মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান সত্ত্বেও তার অন্তরসত্তা প্রাণাভিমুখী ও ইন্দ্রিয়াভিমুখী। এই প্রাণের বৃত্তি তাকে অস্তিত্বের বোধ দেয়। ইন্দ্রিয়বৃত্তি দেয় ভোগ তৃপ্তি। আমাদের জ্ঞান সেই জন্যে এই তুই সঞ্চারকে অতিক্রম করে সূক্ষ্মতর জগতের সত্তাকে গ্রহণ করতে পারে না। কর্ম্মেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা, কর্ম্মই দেয় এর পূর্ণ দৃষ্টি। এই জন্যে কর্ম্মের দ্বারা প্রাণ-কেন্দ্রকে অতিক্রম করতে পারিনে। শাস্ত্রীয় কর্ম্মের শক্তি এই পর্য্যন্ত। জীবসত্তাকে সে যতই সংস্কৃত করুক, কখনও তাকে ভোগস্পৃহা থেকে মুক্তি দিতে পারে না। এই জন্যে শুভ কর্ম্মের দ্বারা পুণ্যবিশেষ অর্জ্জিত হলেও তার ক্ষয় হয়। কর্ম্ম কোন স্থায়ী ফল দেয় না, দিতে পারে না। কারণ তার উৎপত্তি হয় আসক্তি থেকে। আসক্তি প্রাণের সঙ্গে গূঢ়ভাবে সংবদ্ধ। যেখানে প্রাণ আসক্তির সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত, সেখানে প্রাণের সঙ্গে বিরাট সত্তার পরিচয়। সেখানেই পাই প্রাণের সরলতা ও অনন্ত জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু সাধারণত প্রাণের সাড়া আসক্তির সংকীর্ণ বেগ থেকে মুক্ত হয় না। তাই প্রাণ তার বিরাট ছন্দকে উদ্বোধিত করে জ্ঞানের পথ মুক্ত করতে পারে না। লৌকিক কর্ম্ম ও অলৌকিক কর্ম্ম তুয়েরই উৎপত্তি প্রাণের বেগ থেকে। অলৌকিক কর্ম্মের ভোগ সূক্ষ্ম হলেও জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময় সত্তার সাড়া জাগাতে পারে না। উপনিষদে তাই কর্ম্মের প্রশংসা দেখতে পাইনে। আত্মজ্ঞানশূন্য মানব প্রাণ-কেন্দ্রেই সংবদ্ধ।

উপাসনা বিজ্ঞান

মানুষের ভেতর আরও সূক্ষ্ম সংবেগ আছে, যেখানে সে প্রাণের স্থূল সংক্ষোভ থেকে মুক্ত। তখনই উপাসনার আরম্ভ। উপাসনার ভেতর আছে সত্যানুসন্ধানের সংবেদ। মানুষের অন্তর-সত্তাকে সে দীপ্ত করে, জীবনের উচ্চতর প্রকাশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রাণের ঊর্দ্ধ-গতি সঞ্চারে, বিজ্ঞানের সূক্ষ্মবিকাশে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি উপাসনার নিত্য প্রাপ্তি হলেও উপনিষদ শক্তির চেয়ে জ্ঞানকেই বরণ করে নিয়েছে। জ্ঞান দেয় সত্যে প্রতিষ্ঠা, শক্তি দেয় ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠা। যার শক্তিতে সমস্ত বিশ্ববিধৃত ও অনুপ্রাণিত, উপাসনা তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। দিব্যজীবনের, দিব্যজ্ঞানের, দিব্যানু-প্রেরণায় পূর্ণ করে। সত্তার সমস্ত স্তর বিরাট পুরুষের বিশ্ব-লীলার ছন্দে অনুপ্রাণিত করে।

উপাসনার ঊর্দ্ধতর স্তরে মানুষের জ্ঞান এমনি চেতনার অবকাশ লাভ করে যে ক্রমশঃ মানবচেতনা অনুভব করে বিশ্বচেতনার সঙ্গে তার অভিন্নতা। সেই চেতনাকে অবলম্বন করে চেতনার অতিমানসরূপের পরিচয়। ছন্দের আকর্ষণে সগুণ ব্রহ্মের সন্ধান। অনন্ত রূপ, অনন্ত ছন্দ মুখরিত হয় জীবনের উল্লাসে। কিন্তু এত বিভূতিসম্ভারেও চেতনা তৃপ্ত হয় না। তার লক্ষ্য থাকে চেতনার একত্ব অনুভূতি ও প্রতিষ্ঠার দিকে। সত্তার বিরাটত্বের অনুভূতির চেয়ে তার স্বরূপকে জানাই বড়। উপাসনা যে বিজ্ঞানের অবকাশ দেয়, তার ভেতর দিয়ে

সত্যের বিশ্বরূপের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলেও, মানবাত্মা ও পরমাত্মার ভেতর যদি কিছুও ব্যবধান থাকে তা হলে উপনিষদের চরম তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় হয় না। উপাসনা ব্রাহ্মী শক্তিতে ও দীপ্তিতে আমাদের পূরণ করলেও, জীব ও ঈশ্বরের ব্যবধান পূর্ণরূপে তিরোহিত করতে পারে না, চায়ও না। কারণ তার স্থিতি এখানে। উপাসনা চায় দিব্যজীবনের সব বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য। এজন্যেই কখনো কখনো ঈশ্বরীয় স্থিতির সঙ্গে সে প্রতিষ্ঠা করে অভিন্নতা,—সে অভিন্নতা শক্তির অভিন্নতা, সত্তার অভিন্নতা নয়। উপসনা ঈশ্বর-শক্তির সংবেগে জীবকে ঈশ্বর ভাবাপন্ন করতে পারে। কিন্তু তার নিরুপাধিক স্বরূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে না।

কথাটি পরিষ্কার করতে হবে। ঈশ্বরের জ্ঞানের ও শক্তির সীমা নেই। সীমা থাকলে তাঁকে ঈশ্বর বলা যেতে পারে না। তাঁর সত্তা সর্ব্বত্র বিকশিত। তার সংকোচ হতে পারে না। সবই ঈশ্বরের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। তিনি মুক্তির কারণ—অনাদি, অব্যয়। তিনি তাঁর অপ্রতিহত শক্তিতে বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত করেন। বিশ্ব ঊর্ণনাভের জালের মত তাঁর থেকেই প্রসূত।

জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্য এই জ্ঞান ও শক্তির সীমা ও অসীমত্ব নিয়ে নির্দ্ধারিত হয়। জীবের জ্ঞান ও শক্তি সসীম; ঈশ্বরের তা অসীম।

জীবের এই সীমাবোধ তাকে ক্ষুদ্র করেছে। এ সীমার বেষ্টনী তাকে বদ্ধ করেছে সংসৃতির প্রবাহে। কিন্তু তার নৈসর্গিক আস্পৃহা জ্ঞানের ও শক্তির সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি। এই আস্পৃহার জন্যেই সে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। কোন প্রবৃত্তির প্রেরণাই তাকে তৃপ্ত করতে পারে না। কারণ তাদের উৎপত্তি হয় জীবনের প্রাথমিক প্রেরণা থেকে। এ প্রেরণা স্বভাবের সহজ সংস্কার। তার সঙ্গে উচ্চতর চেতনার কোন সম্বন্ধ নেই। প্রাথমিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় জীব বিষয় হতে বিষয়ান্তর ভোগ করে।

মানুষ কেবল শরীর ও প্রাণ নয়, তার সব চেষ্টার মূলে আছে একটা বিকশিত হবার আস্পৃহা। এ বিকাশের বেগ উৎপন্ন হয় প্রাণস্তরে, মনস্তরে, বিজ্ঞানস্তরে, আনন্দস্তরে। স্থূল বিকাশে তার স্বভাবের তৃপ্তি নেই। তাই সূক্ষ্ম বিকাশের জন্যে সে চায় ঈশ্বরের সম্বন্ধ। উপাসনায় তা স্ফুর্ত্ত হয়ে ওঠে। ভাবনার আতিশয্যে ক্রমশঃ ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়।

উপাসনা ও জ্ঞান

মানুষের মনের গতি বাইরের দিকে। আত্ম-কেন্দ্রহীন মন বিষয় নিয়ে থাকে। এমন কি উপাসনায়ও মন ধ্যেয়ের প্রতি ধাবিত হয়—ধ্যেয় আত্মাতিরিক্ত ঈশ্বর বা ঈশ্বরের কোন নাম, জ্ঞান বা শক্তি বিগ্রহ। মনের এই আত্মকেন্দ্রহীনতারূপ

স্বাভাবিকী বৃত্তি উপাসনায়ও বিনষ্ট হয় না। উপাসনার লক্ষ্য ব্যাপক ঈশ্বরীয় রূপ হলেও ঈশ্বর জ্ঞান অতিক্রম করে' উপাসনা চলতে পারে না। অন্তর বৃত্তি এখানে বিষয়াকারে উদ্‌বোধিত হয়—ঈশ্বর বিষয় বলে নানাবিধ রমণীয় বৃত্তিতে—সূক্ষ্ম জ্ঞানে, দিব্যভাবে, দিব্যশক্তিতে এর প্রেরণা।

এখানে জ্ঞান আছে, বিশেষরূপে—নির্বিশেষ রূপে নয়। আত্মজ্ঞান নির্বিশেষ জ্ঞান, অতএব উপাসনা সিদ্ধ হলেও জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবিতা থেকে যায়। কারণ আত্মা বৈ ইদং সর্ব্বং এ জ্ঞান উপাসনায় হয় না। জ্ঞানের শেষ বিষয় বাহিরের কিছু নয়—অন্তরে ও বিশ্ব অন্তরে স্থিত অখণ্ড পুরুষ। এখানে অন্তরের কোন বহিঃ বৃত্তি থাকে না, এমন কী ধ্যানের আস্বাদ্যও কিছু থাকে না—অসংসারী আত্মার হয় জাগরণ; এই যে জাগরণ ইহার একটি বিশেষ রূপ আছে। এ জাগরণে জীবত্বের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অবসান। বৃত্তিহীন জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ। এজন্য পরবর্ত্তী আচার্য্যেরা ব্রহ্মের বৃত্তি ব্যাপ্যত্ব আছে বলতেন, ব্রহ্মাকার বৃত্তির অবসানে ব্রহ্মস্থিতি।

ব্রহ্মাকার বৃত্তি উপাসনায় যত প্রকার বৃত্তির উদ্‌গম হয়, তা হতে ভিন্ন। উপাসনা বৃত্তির উপাস্যের রূপ নিয়ে স্ফূর্ত্তি। কিন্তু ব্রহ্মের ত কোন রূপ নেই—অন্তর যখন ব্রহ্ম বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মাকার বৃত্তিরূপে স্ফুর্ত্ত হয়; তখনত কোনরূপই থাকে না, কারণ ব্রহ্ম নীরূপ। ব্রহ্মাকার বৃত্তি স্বতন্ত্র জিনিষ।

সিদ্ধির রূপ

এখানে সিদ্ধির ছুটো পথ। উপাসনা দ্বারা ক্রমশঃ ঈশ্বরের শক্তিকে আকর্ষণ করে সত্তাকে পূর্ণ করতে পারি এবং নানাবিধ যোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী হতে পারি। এই হল যোগের পথ। এ পথে শক্তির নানারূপ আবেগ অধিকৃত হয়, দিব্য বিভূতি বিকশিত হয়ে ওঠে, মানুষ তার প্রবৃত্তির সংস্পর্শ ও সংবেগ থেকে উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু যোগের এটিই মুখ্য ফল নয়। সে ফল ঈশ্বর-জ্ঞান ও শক্তির পরিচয়। প্রকৃতির অধীনতাই জীবত্ব, প্রকৃতির ওপোর কর্ত্তৃত্বই ঈশ্বরত্ব। উপাসনার ফলে জীবে কখনও ঈশ্বরত্বের আবেশ হয়। উপাসনার দ্বারা জ্ঞানের ও শক্তির আতিশয্যে পূর্ণ হই। উপাসনা বিশ্বের কল্যাণছন্দে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রাণের ও বিজ্ঞানের স্পন্দনের পরিচয় করিয়ে দেয়। তবুও সে অতিক্রম করতে পারে না এই ছন্দোময় জীবনের কল্যাণ-মূর্ত্তি,—তার প্রতিষ্ঠা সেখানেই।

মানুষের অন্তর্জীবনের ছন্দ আছে। প্রকৃতির ছন্দ আছে। ছন্দের সঙ্গে প্রাণশক্তির নিগূঢ় সম্বন্ধ। সৃষ্টি ছন্দেরই বিকাশ। ছন্দোবদ্ধ প্রাণসঞ্চার সৃষ্টিকে এত মধুর করেছে। সৃষ্টির সব স্তরেই এক অন্তর্নিহিত ছন্দের প্রেরণা আছে। এই ছন্দের ধারাই সৃষ্টির সকল স্তরে প্রকাশিত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে। প্রাকৃত জগতের ভেতর দিয়ে যে জীবন ও ছন্দের প্রকাশ, তাকে উপনিষদের ভাষায় বলা যেতে পারে অধিভূত। আর অন্তর্জীবনের

ভেতর যে ছন্দ অনুভূত হয়, তাকে বলা যেতে পারে অধ্যাত্ম। বহিঃপ্রকৃতির আর অন্তঃপ্রকৃতির এই ছন্দের ভেতর একটা গূঢ় সম্বন্ধ আছে। তার কারণ এক অনবচ্ছিন্ন জীবনধারাই প্রকাশিত হচ্ছে অন্তঃ ও বহির্জীবনের ভেতর দিয়ে। গভীর ছন্দের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত অনন্ত জীবনধারা ভেদবোধ অপসারিত করে। জীবনের এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত প্রকাশ ভিন্ন আরও উচ্চতর প্রকাশ আছে অধিদৈব জগতে। অধিদৈব জগৎ অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগতের সমন্বয়কেন্দ্র। সেখানে চৈতন্যের সূক্ষ্মতা, দীপ্তি ও প্রাণের সুখময় কম্পন। অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের ছন্দ এক হয়ে যায়। এই অধিদৈব জীবন স্বচ্ছ, প্রকাশশীল।*

উপাসনা অন্তঃ ও বহির্জীবনের মধ্যে এই অধিদৈব জীবনের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে। ধ্যানস্তর থেকে জ্ঞানের দিকে এগিয়ে

---

* উপনিষদে প্রায়ই অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব এই তিনটি কথার উল্লেখ আছে। এদের অর্থ জানা উচিত। একই চৈতন্যের এই তিনটি রূপ। চৈতন্য এক হলেও, তার প্রকাশ হয় অন্তঃ ও বহির্বিশ্বে। অন্তরে, বিশেষতঃ অন্তরের নানাবিধ ক্রিয়ার ভেতর দিয়ে, অধ্যাত্ম; বাহিরে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও ভূতবস্তুসমূহের ভেতর দিয়ে অধিভূত; আর অন্তরীক্ষে সূর্য্য, চন্দ্রমা, গ্রহাদির ভেতর দিয়ে, তার প্রকাশ হয় অধিদৈব। অধ্যাত্ম subjective, অধিভূত objective। অধিদৈব এ দুটির সমন্বয়। সূর্য্য, চন্দ্রমা ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের অন্তঃ ও বহির্জগতের একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ (correspondence) আছে; যেমন বুদ্ধির সঙ্গে সূর্য্যের, মনের সঙ্গে চন্দ্রমার, চোখের সঙ্গে তেজের, ঘ্রাণের সঙ্গে গন্ধের। ধ্যানের একটি ভূমিকায় এ সম্বন্ধের জ্ঞান হয়।

দেয়। উপাসনার প্রত্যক্ষ ফল সমস্ত বিশ্বের একটি দিব্যরূপ। সাধক এই দিব্যরূপের ভেতর দিয়ে ঈশ্বরতত্ত্বের বিরাটত্ব ধারণা করতে থাকে। তার অন্তর দীপ্ত হয় ঈশ্বরপ্রকাশে, স্ফূর্ত্ত হয় তাঁর শক্তিতে। এ অবস্থায় মানুষ ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে, কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না। উপনিষদের দৃষ্টিতে এ জ্ঞানও পরাজ্ঞান নয়, জীবত্বের পরিধি থাকা পর্য্যন্ত মানুষ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করতে পারে না। আরোহণের পথে যত সুন্দর জীবনের বিকাশ হোক না কেন, যত সূক্ষ্মজ্ঞানের গভীর আধার হোক না কেন, সমস্ত প্রকাশকে পেরিয়ে সত্য সেখানে নিজের মহিমায় ("স্বে মহিম্নি") স্থিত, উপাসনায় সেখানে পৌঁছিয়ে দিতে পারে না। ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধতর লোকের স্বচ্ছতা, শুভ্রতা, প্রজ্ঞা বুদ্ধিকে উদ্‌ভাসিত করলেও অনাবৃত জ্ঞান প্রকাশিত হতে পারে না। এখানেই তার লাঘবতা। তখন আবশ্যক হয় ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ভাবনা; এই ভাবনা আমাদের মুক্ত করে বিশ্বলীলার ও বিশ্বসৃষ্টির স্পন্দন থেকে। যে সনাতন অবিদ্যা ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ সৃষ্টি করেছে তাকে অপসারিত ক'রে মুক্তির চরম সার্থকতা দেয়।

সাধনার দুটী পথ—একটী সদ্যমুক্তির, আর একটী ক্রমমুক্তির। মুক্তি বল্‌তে বুঝি জ্ঞানের ও শক্তির ক্ষুদ্রতার অপসারণ। এ অবস্থা এমনি যেখানে জীবত্বের সব সংবেগ, সংকীর্ণতা অতিক্রম করে বৃহত্তর ও দিব্যতর জীবনের সন্ধান পাই। সাধক লাভ করে দৈবী সম্পদ। তখন জীবনের ভেতর দিয়ে

প্রকাশিত হয় ভাগবত মূর্চ্ছনা। জীবন লীলায়িত হয়ে ওঠে ব্রাহ্মী ছন্দে। জীবনধারার অভিব্যক্তি মানবেই শেষ হয়নি, তার আরও ঊর্দ্ধবিকাশ আছে—এবং মানুষ উপাসনার দ্বারা সেই অলৌকিক পথে আরোহণ করে। এই হ'ল তার দিব্য সিদ্ধি। এই পথে যোগজ শক্তির বিকাশ। তপঃশক্তিতে ইচ্ছা হয় অপ্রতিহত। এরূপ অবস্থা বিশেষকেও মুক্তি বলা হয়। কারণ এখানে পাই সংকীর্ণ জীবনের সমস্ত খর্ব্বতা থেকে পরিত্রাণ। কিন্তু অবিদ্যা থেকে এও প্রকৃত মুক্তি দেয় না। আত্মস্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলে দেশ, কাল, কর্ম্ম থেকে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হই। আত্মস্বারাজ্য শ্রেষ্ঠতম মুক্তি। সিদ্ধির শক্তি এখানে অকিঞ্চিৎকর। এই আত্মস্বারাজ্যই চরম প্রাপ্তি, এখানে অবিদ্যা অপসারিত। আত্মবিকাশ স্পন্দনশূন্য, স্বপ্রভায় উদ্ভাসিত—শিবম্, শান্তম্, অদ্বৈতম্। বিশ্বছন্দের ঊর্দ্ধে প্রজ্ঞালোক উদ্ভাসিত ; ছন্দ, ভাষা, স্পন্দন অন্তর্হিত। সে ব্যক্ত নয় অব্যক্তও নয়। ব্যক্তাব্যক্তের অতীত। বিশ্বচক্রের বিবর্ত্তন শান্ত, শক্তি নির্ব্বাপিত, বিশ্বলীলা স্তব্ধ। এই সত্য, এই মহিমা, এই অভয়। উপনিষদ বিদ্যায় এই অভয় প্রতিষ্ঠা।

ব্রহ্ম কী

সমস্ত উপনিষদে মাত্র দুটী প্রশ্ন—ব্রহ্ম কী? এবং ব্রহ্ম সাধনা কী? প্রথমটী করে তত্ত্বনির্ণয়, দ্বিতীয়টী দেয় তত্ত্ববোধ।

উপনিষদ অন্তরে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে, অজ্ঞান দূরীভূত করে। আচার্য্য শঙ্কর উপনিষদ শব্দের এই রকম ব্যাখ্যা করেছেন। অজ্ঞান জ্ঞানের আবরণ। অবিদ্যার অপসারণ বিদ্যালাভের উপায়। একমাত্র উপনিষদই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারে।

এই ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ আচার্য্যের মুখে শুনতে হয়। শ্রবণ বিষয়ে অনুপ্রবেশ দেয়। বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট হলে মনন করি। শ্রুতি অনুকূল বিচারের নাম মনন। মননের দ্বারা বুদ্ধি উজ্জ্বল হয়। তত্ত্ববিষয়ে সকল সংশয় দূরীভূত হয়। তখন তত্ত্বধ্যানে মগ্ন হই। ধ্যান দেয় তত্ত্বের সাক্ষাৎ জ্ঞান। উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যা শুধু যুক্তির উপর স্থাপিত হয়নি। যুক্তির অনন্ত রূপ। তার দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। শ্রুতিতে যুক্তির কথা থাকলেও, অনুভূতি ও আপ্ত-বাক্যের ওপর বেশী আস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

শ্রবণের সার্থকতা উপলব্ধি হলেই গুরুর কাছে যাই ও প্রশ্ন করি—ব্রহ্ম কী ?

তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই বিদ্যা অতি সরলভাবে নিরূপিত হয়েছে। ভৃগু তাঁর পিতা বরুণের কাছে গিয়ে ব্রহ্ম কী জানতে চাইলেন। পিতা উপদেশ দিলেন, "যা থেকে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হ'য়ে জীবিত থাকে, যাতে আবার প্রবিষ্ট হয়, তাকে জান, তাই ব্রহ্ম।" সকল কার্য্যেরই কারণ আছে ; কিন্তু যা প্রথম কারণ, তার আর কারণ থাকতে পারে না। যা বিশ্ব-কারণ, তাকে শ্রুতিতে ব্রহ্ম বলা যায়। ব্রহ্ম শব্দটীর অর্থ বৃহৎ ; যার চেয়ে বৃহত্তর আর কিছু হ'তে পারে না, তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই বিশ্বসৃষ্টির একমাত্র কারণ। বিশ্ব উৎপন্ন হ'য়ে ব্রহ্মেই বিধৃত আছে। সৃষ্ট হয়েও জগৎ ব্রহ্ম থেকে পৃথক হয়নি। বিশ্বাধারে তিনি নানা রূপ নিয়ে প্রকাশিত হ'লেও, কখনও বিশ্ব থেকে পৃথক হননি। তাঁর শক্তি ও সত্তা সর্ব্বত্র প্রকাশিত। সৃষ্ট জগৎ তারই ভিন্ন মূর্ত্তি। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তারূপে জগৎ সৃষ্টি ক'রে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন নি, জগতের ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে জগৎকে অনুপ্রাণিত করেন। জড়জগৎ, প্রাণজগৎ, চিন্ময় জগৎ সকলের ভেতর প্রবিষ্ট হ'য়ে তিনি সত্তারূপে, প্রাণরূপে, জ্ঞানরূপে, আনন্দরূপে প্রকাশিত হচ্চেন। জলে বুদ্‌বুদের মত ব্রহ্মে উৎপন্ন হ'য়ে ব্রহ্মেই লয় হয়। ব্রহ্ম হতে সৃষ্টি, ব্রহ্মে স্থিতি, ব্রহ্মেই তার লয়। সৃষ্টি ব্রহ্মের বিশ্বানুপ্রবেশ, লয় বিশ্বের ব্রহ্মানুপ্রবেশ।

সামান্যরূপে এইভাবে তত্ত্বনির্ণয় করে সেই তত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ করবার জন্যে ভৃগু ও তাঁর পিতা বরুণের মধ্যে একটি বিশদ আলোচনা হয়। সেই আলোচনায় নানা বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। তাতে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ভৃগু তপস্যা করে এসে বল্লেন, যা থেকে এই বিশ্বের উৎপত্তি, যাতে বিশ্বের বিধৃতি এবং যাতে বিশ্বের অনুপ্রবেশ তাই যদি ব্রহ্ম হয়, তবে অন্ন হবে ব্রহ্ম। কারণ "অন্নে এই প্রাণীরা উৎপন্ন, অন্নে জীবিত, অন্নেই তিরোহিত"। পিতা বল্লেন আবার তপস্যা করতে। দ্বিতীয় বারের তপস্যায় ভৃগু জানলেন "প্রাণ ব্রহ্ম। প্রাণে এই জগৎ উৎপন্ন, প্রাণে স্থিত এবং প্রাণেই তিরোহিত"। বরুণ কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না, আবার তপস্যা করতে বল্লেন। এবার ভৃগু জানলেন "মন ব্রহ্ম। মনে বিশ্ব সৃষ্ট, মনে বিশ্ব স্থিত, মনেই তার লয়।" বরুণ কিন্তু আবার তপস্যা করতে বললেন। চতুর্থবারে ভৃগুর মনে হ'ল "বিজ্ঞান ব্রহ্ম। বিজ্ঞানে বিশ্বের উৎপত্তি, বিজ্ঞানে ধৃতি, বিজ্ঞানেই পুনঃ প্রবেশ।" বরুণ বল্লেন আবার তপস্যা করতে, এবারের তপস্যায় ভৃগু বুঝলেন, "আনন্দ ব্রহ্ম। আনন্দে এই ভূতসকলের উৎপত্তি, আনন্দে স্থিতি, আনন্দেই অনুপ্রবেশ।" এই বিদ্যাকে ভার্গবী-বারুণী বিদ্যা বলা হয়েছে।

সূত্রাকারে উপনিষদের তত্ত্ব বলা হ'ল। মানুষের তত্ত্বজিজ্ঞাসা হ'লেই সৃষ্টির মূল অনুসন্ধান করে। দৃষ্টি ক্রমশঃই গভীর ও সূক্ষ্ম হয়। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয়—অন্নই ব্রহ্ম,

O. P. 99—8

অন্নই তত্ত্ব। অন্নকে জগতের উৎপত্তির ও স্থিতির কারণ বলা হয়েছে। এ অন্ন কিন্তু স্থূল অন্ন নয়। এ হচ্ছে শক্তি বা শক্তির সেই রূপ যা জড়জগতে ক্রিয়াশীল এবং জড়-জগতের সমস্ত ক্রিয়ারই নিরূপক। জড়জগতে অণুপরমাণুর সমাবেশ আছে, সৃষ্টবস্তুর রূপ আছে, আকার আছে। এর থেকেই বোঝা যায় এই শক্তির কোন বিশেষ রূপ বিশ্বের বিধৃতির ও বিকাশের কারণ। এই শক্তিই অন্ন। অন্ন কথাটি এখানে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্নের দ্বারাই আমরা জীবিত থাকি, অন্নের দ্বারাই আমরা পুষ্ট হই। অন্নই বিশ্ব-কারণ। এ শক্তির এমন কোন যোগ্যতা নেই যা প্রাণরূপে প্রকাশিত হতে পারে। অন্নদৃষ্টি সত্যের নিম্নতম দৃষ্টি। এ দৃষ্টিশক্তির জড়বিকাশকেই লক্ষ্য করে। এর সূক্ষ্মতর বিকাশকে লক্ষ্য করে না।

শক্তি আরও উর্দ্ধ পর্য্যায়ে প্রাণ, মন, বিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত। অন্নের পর নির্দ্দেশ করা হ'ল প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাণও শক্তি-বিশেষ। শক্তি যখন জড়ের ক্রিয়া অতিক্রম করে' প্রাণসঞ্চার করে, তখন সৃষ্টি আরও সূক্ষ্মস্তরে উন্নীত হয়। অচেতন শক্তির ক্রিয়ার স্থলে প্রাণনক্রিয়ার আকুঞ্চন প্রসারণ ও বর্দ্ধনের পরিচয় পাই। প্রাণের দৃষ্টিতে সমস্ত জগৎ জীবিত বলে মনে হয়। অন্নের জগৎ থেকে প্রাণের জগতের এই প্রভেদ। প্রাণজগতে একটি কেন্দ্র নিয়ে শক্তির প্রকাশ দেখতে পাই। সৃষ্টির স্তরে এ এক নবীন বিকাশ। স্থূল জগতে প্রাণহীন ও চেতনাহীন শক্তির সঞ্চরণ

অত্যন্ত অস্পষ্ট। সেখানে জড়তা বেশী। কিন্তু প্রাণস্তরে শক্তির প্রকাশ স্ফুটতর। প্রাণ কেন্দ্রগত সঞ্চারণে আত্মপ্রকাশ করে। জীবাণুতে এই প্রাণের ক্রিয়া সুস্পষ্ট। বাইরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিস্তার করেও শক্তি এখানে কেন্দ্রগত। প্রাণের রূপ এ ভাবেই বুঝি।

উপনিষদে প্রাণকে বিশ্বতত্ত্ব বলে গ্রহণ করা হয়। একে সৃষ্টির পুংতত্ত্ব (Positive Priuciple) বলা যায়। প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে, প্রজাপতি সৃষ্টিকাম হয়ে প্রাণ ও রয়ি সৃষ্টি করলেন। প্রাণ পুংতত্ত্ব, রয়ি স্ত্রীতত্ত্ব।* প্রাণ রয়িকেই অবলম্বন করে নানাবিধ সৃষ্টির বিকাশে লীলায়িত হয়। এ প্রাণ মহাপ্রাণ। বার্গসঁর ভাষায় একে Elau Vital বলা চলে। উপনিষদে প্রাণ শব্দকে অনেকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু শক্তি যখন প্রাণন ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হয় তখনই তাকে মূলতঃ প্রাণ বলে। কিন্তু তত্ত্বের এইটেই চরম দৃষ্টি হতে পারে না। প্রাণময় বিশ্বে পাই জীবনের সাড়া ও স্পন্দন, কিন্তু এখানেও পাইনে উচ্চতর বিকাশের রূপ।

প্রাণ ও অন্নের ভেতর সম্বন্ধ আছে। প্রাণের স্থূল রূপ অন্ন। একই তত্ত্বের ক্রিয়াত্মক অংশ প্রাণ, জড়াত্মক অংশ অন্ন। প্রাণস্পন্দনের আধার অন্ন। প্রাণস্পন্দের মন্দীভূত অবস্থা

---

* প্রাণকে পাশ্চাত্য দার্শনিকের ভাষায় Life Principle বলা চলে, রয়িকে বলা চলে Matter।

অন্ন। শক্তির স্তব্ধীভূত অবস্থা জড়। স্পন্দনরূপা শক্তি প্রাণ।

প্রাণদৃষ্টিকে অতিক্রম করে সত্যকে (তত্ত্বকে) মন বলা হয়েছে। মন সঙ্কল্পাত্মক, ইচ্ছার আশ্রয়। সঙ্কল্পের সঙ্গে প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সঙ্কল্পের জাগরণে প্রাণের চাঞ্চল্য। মন প্রাণ একত্রে ক্রিয়া করে। এদের বলতে পারি প্রাণমনশক্তি (Vital-Mental Principle)। প্রাণ সঙ্কল্পের সঞ্চারণে ক্রিয়াশীল হয়, তা অনুভবসিদ্ধ। মন এখানে উচ্চতর বিজ্ঞান নয়। মন সঙ্কল্প বিকল্প করে। সূক্ষ্ম প্রাণের সাথে এর সম্বন্ধ। তাই একে প্রাণের ভেতর চেতনার সাড়া বলে গ্রহণ করা যেতে পারে, অথচ এই চেতনা বিজ্ঞানজগতের মত সুস্পষ্ট ও প্রণালীবদ্ধ নয়। এদের ছন্দ আছে। ছন্দই দেয় এদের স্বচ্ছতা। স্বচ্ছতার অভাব থেকেই অনেক সময় এদের ক্রিয়া ও প্রকাশ হয় অস্পষ্ট। ছন্দোবদ্ধ প্রাণে মনের সুষ্ঠু বিকাশ।

মনকে অতিক্রম করে বিজ্ঞানজগতের পরিসর। বিজ্ঞান মন হতে সূক্ষ্মতর সত্তা। এখানে আছে বোধের স্থির ও সত্য দৃষ্টি। এই স্তরে বোধের স্বচ্ছতায় পাই চিতির স্পন্দন (Idee-force)। মনের আলো অস্পষ্ট, বিজ্ঞানের আলো স্পষ্ট, ভাস্বর ও দীপ্ত। কোন অস্পষ্ট ধারণা বা ভাবনা এখনে নেই, নেই কোন সঙ্কল্পের ক্রিয়া। সঙ্কল্প ক্রিয়াত্মক, বিজ্ঞান প্রকাশাত্মক। এই প্রকাশ ক্রিয়াহীন নয়। ক্রিয়াশীল

হয়েও সে প্রকাশশীল। সঙ্কল্প ক্রিয়াশীল, কিন্তু প্রকাশশীল নয়। তত্ত্বচিন্তায় এইভাবে বিজ্ঞানকেও কখন বিশ্বসত্তা বলা হয়। প্রকাশশীল সত্তাই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা।

বিজ্ঞানের জগত চিতিশক্তির আলোকে উদ্ভাসিত। এখানে প্রাণের স্পন্দন স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, ইচ্ছা সংকল্পের সংকীর্ণতা হতে মুক্ত। ইহা চিতিশক্তির মূর্ত্ত বিকাশ। প্রাণ ও মনের স্থিরতায় বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রকাশ। জ্ঞানই শক্তিরূপে প্রকাশিত। বিজ্ঞানে শক্তির স্পন্দন আলোকিত।

তত্ত্বের পর্য্যায়ে আরও উর্দ্ধে আরোহণ করলে সত্তার আনন্দ-রূপ প্রকাশ হয়। আনন্দই ব্রহ্ম। প্রকাশের রমণীয়তা ও কমনীয়তা দেয় আনন্দ। আনন্দ বিকাশের উল্লাস। সে বিকাশ বাধাহীন। পূর্ণতম বিকাশেই আনন্দের প্রতিষ্ঠা। অন্তহীন অবকাশে, বাধাহীন প্রকাশেই আনন্দের স্থিতি। আনন্দ, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান এর চেয়েও সূক্ষ্মতর তত্ত্ব। সে দেয় ঋতময় বোধের সঙ্গে সুখময় বোধ। ঋত, প্রজ্ঞা ও আনন্দই পরম প্রতিষ্ঠা। এই আনন্দদৃষ্টি অলৌকিক দৃষ্টি। মানসভূমিতে সে প্রতিষ্ঠিত নয়, অতিমানস চেতনায় প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব আনন্দোদ্ভূত ও আনন্দধৃত। এ সংবেদ (feeling) নয়—বিশ্বতত্ত্ব, পরম সত্য। আনন্দেই প্রাণ-মন সঞ্জীবিত। জ্ঞানের বিকাশ আনন্দেই। আনন্দই জীবনের মূল সূত্র। আনন্দই জীবন, জীবনই আনন্দ। এই আনন্দ-সংবাদ তৈত্তিরীয় উপনিষদের পরম বক্তব্য। আনন্দের

দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টি ও বিদ্যানুভূতি। পূর্ণসত্তার জ্ঞানেই মানুষ তার ক্ষুদ্রত্বকে অতিক্রম করে। পূর্ণজ্ঞান দেয় আনন্দে প্রতিষ্ঠা। তখন মানুষ তার সাধারণ মানসজ্ঞানকে অতিক্রম করে শুদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশ্বের অন্তঃসত্তা অনুভব করে। তখন সে অজ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই অমৃত, এইই কল্যাণ।

বৃহদারণ্যকে এই আনন্দের কথা স্ফুটতর হয়েছে। এই আনন্দ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বিশ্বসত্তারূপে নির্ণীত হয়েছে।

আনন্দ ব্রহ্ম

উপনিষদে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে সঙ্কল্প করলেন। তিনি তাঁর দুই পত্নীকে সম্পত্তি ভাগ করে দিতে চাইলেন। মৈত্রেয়ী বল্লেন, "যা আমায় অমৃত দেবে না তা নিয়ে কি করবো?" মৈত্রেয়ীর ধনসম্পত্তি ও বিত্তের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা নেই দেখে যাজ্ঞবল্ক্য বল্‌লেন, "মৈত্রেয়ী, তুমি চিরকালই আমার প্রিয়। আজ আরও প্রিয় হ'লে। তোমাকে অমৃতের উপদেশ দিচ্ছি।" তারপর যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ দিলেন, "পতি যে জায়ার কাছে প্রিয় তার কারণ পতি নয়, পতির ভেতর জায়া নিজের স্বরূপ দেখে বলেই। তেমনি জায়া যে পতির প্রিয় তার কারণ জায়া নয়, জায়ার ভেতরে পতি নিজের স্বরূপ দেখে বলেই। আসলে আত্মাই পরম প্রিয়। আত্মসম্বন্ধশূন্য হয়ে কেউই প্রিয়

নয়। আত্মপ্রীতি পরম প্রীতি, সে প্রীতি অহেতুকী প্রীতি। বস্তু-প্রীতি আনন্দেরই প্রকাশ।

এই বিরাট বিশ্ব, তার অপরূপ দৃশ্য, তার রূপরাশি, তার অনন্ত অবকাশ—সমস্তই আমাদের অন্তরে আনন্দ জাগায়। বিশ্বব্যাপী আত্মাকেই আমরা এর ভেতরে দেখতে পাই। তাই এরা আত্মারই বিশ্বরূপ। যে আনন্দ বিশ্বের মূলে, সে আনন্দ আমাদের হৃদয়-গুহায়ও। সে আনন্দই আত্মা। বিশ্ব-আত্মা আমার আত্মা, আমার আত্মাই বিশ্ব-আত্মা। আত্মাই পরমাত্মা। আত্মা আনন্দ বলেই প্রেমাস্পদ। পরমাত্মা আত্ম-স্বরূপ বলেই পরম প্রীতির বিষয়। মানুষ চায় আনন্দ, তার স্বরূপই আনন্দ। তার ভেতর আছে আনন্দের আস্পৃহা, আর সে আনন্দ পায় সত্তার বিকাশে। আত্মার বিশ্বরূপ জাগায় বিশ্বপ্রীতি। বিশ্বপ্রীতির মূলে আত্মপ্রীতি। আত্মারই ছায়া বিশ্ব। বিশ্ব আত্মারই রূপ।

সত্য, জ্ঞান, আনন্দ

সত্তার রূপ আনন্দরূপ। উপনিষদের পরম বক্তব্য এই। প্রথম দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সত্তা (Existence) রূপে প্রতীত হয়। সকলের মূলে এক অবিভক্ত সত্তা। বিভক্ত সত্তা অপূর্ণ রূপ। অবিভক্ত সত্তা সত্যের রূপ। অনবচ্ছিন্ন সত্তা বলতে বাধাহীন উদার স্থিতিকে বুঝি। স্থিতিরূপতা সত্তার প্রধান লক্ষণ। কিন্তু এ সত্তা শুধু স্থিতিরূপই নয়, ইহা সঞ্চারশূন্য জ্ঞান ও

আনন্দ। চৈতন্যের ও আনন্দের সঞ্চার যেখানে, সেখানে সত্য কেন্দ্ররূপে (Centralised) স্ফুরিত হয়। জ্ঞানের ও আনন্দের বিকাশ ও সঞ্চরণ কেন্দ্রস্থ সত্তাকে নিয়ে সম্ভব। এটা সৃষ্টির প্রাথমিক ক্ষণ। সৃষ্টির অর্থ—সত্তার কেন্দ্রীভূত অবস্থা প্রাপ্তি ও শক্তির মূর্ত্তবিকাশ। কিন্তু সৃষ্টির উর্দ্ধে সত্তার অখণ্ড অবিভাজ্য স্বরূপে আনন্দ ও জ্ঞানের সঞ্চার নাই। এখানে আছে আনন্দ ও জ্ঞানস্বরূপতা,—সত্তাস্বরূপ, স্পন্দনশূন্য জ্ঞান ও আনন্দ। উদ্বেলতাশূন্য নির্বিশেষ দীপ্তি ও প্রসার। দীপ্তি জ্ঞানসূচক। প্রসার আনন্দসূচক। আবরণশূন্যতাই আনন্দের রূপ। আনন্দের সংবেদ এখানে নাই। সংবেদশূন্য আনন্দই আনন্দের স্বরূপ। এরূপ আনন্দ সত্তার নামান্তর। উদ্বেলিত আনন্দের স্থানে শাশ্বত আনন্দ। সঞ্চারশূন্য আনন্দ ব্রহ্মানন্দ।

অখণ্ড সত্তার জ্ঞান নিরুপাধিক। দীপ্তিস্বরূপ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি নাই, বিষয় নাই। প্রজ্ঞাস্বরূপে প্রজ্ঞালোকের প্রভা নাই। স্থূল সূক্ষ্ম লোকের আলোক-স্পন্দন নাই। যে প্রজ্ঞার লহরী-মালায় বিশ্ব ও বিশ্বাতীত সূক্ষ্ম জগৎ উদ্ভাসিত, যে প্রজ্ঞায় 'ঋতম্' ধৃত, সেই প্রজ্ঞার অতীত এই প্রজ্ঞারূপ। এই নির্ম্মল শান্ত জ্যোতিঃ প্রজ্ঞান ঘন। স্পন্দনরহিত প্রজ্ঞাই ব্রহ্মজ্ঞান।

ব্রহ্মকে যখন জ্ঞানস্বরূপ বলি, তখন তার প্রকাশরূপতাকেই লক্ষ্য করি। যখন আনন্দস্বরূপ বলি তখন তার রমণীয়তাকে লক্ষ্য করি। নির্ম্মুক্ত নিরাবরণ প্রকাশ পরম রম্য।

ব্রহ্ম ও রস

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে রস কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রহ্মকে 'রস' বলা হয়েছে। 'রস' বলতে সাধারণতঃ এমন কিছু বুঝি যা আমাদের ভেতরে আনন্দকে বাড়িয়ে দেয়। জীবনের মূলে আছে রস। রস প্রাণকে সঞ্জীবিত করে। এই রসই আনন্দ; আনন্দের সঙ্গে প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আনন্দ যেখানে পূর্ণ, প্রাণ সেখানে প্রশান্ত। আনন্দে প্রাণের পুষ্টি। প্রাণের উপজীব্য আনন্দ। আনন্দের অভাবে প্রাণের চাঞ্চল্য। তখন তার রসসঞ্চার হয় না। ব্রহ্মই রস, এই রসকে লাভ করে আমরা আনন্দকে লাভ করি। শ্রুতি বলেছেন জীবনের মূলে আছে আনন্দ রস—'আকাশ আনন্দ না হ'লে কে প্রাণ ধারণ করত ?'

বিশ্বে সকলের মূলে এই রস আছে বলেই তারা আনন্দ দেয়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের আকর্ষণ এখানে। যেখানে আনন্দ, ব্রহ্মরস সেখানে। বিষয়ের আনন্দও ব্রহ্মানন্দ, তবুও সেখানে নাই তার পূর্ণবিকাশ। তাই সে চিরন্তন আকর্ষণের কারণ হয় না। তাতে পাইনে পূর্ণ তৃপ্তি। কারণ, আনন্দ এখানে বিষয়কে অবলম্বন করে প্রকাশ পায়।

সৃষ্টির স্তরবিশেষে আনন্দের বিকাশ হয় ভিন্নরূপে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে মানুষের আনন্দ, গন্ধর্ব্বের আনন্দ, দেবতার আনন্দ, ইন্দ্রের আনন্দ, প্রজাপতির আনন্দের উল্লেখ আছে। এই সব আনন্দলোক ব্রহ্মানন্দেরই ছায়া এবং

এইখানে যে আনন্দ অনুভূত হয় তাও ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ এই স্তরে বিকশিত হয় না বলেই এইসব স্তরকে অতিক্রম করতে হয়। তবেই হয় ব্রহ্মানন্দের লাভ। উপনিষদে আনন্দসাধনার এই বিশেষত্ব। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ থেকে আরম্ভ করে সৃষ্টির সব স্তরে একই আনন্দের বিকাশ। বিষয়কে বিষয়রূপে না দেখে আনন্দরূপে দেখলে, বিষয় ব্রহ্মানন্দের দিকে বাধা না হয়ে বরং উপায় হয়। এই দৃষ্টি বিষয়দৃষ্টি নয়, এ ব্রহ্মদৃষ্টি। বিষয়ের ভেতর একটি অনুপম সৌন্দর্য ও মাধুর্য পাই। এইভাবে বিষয়ের বিষয়রূপ অপসারিত হয়। বিশ্বের সকল বস্তু ও সকল সঞ্চারের ভেতর দিয়ে হয় আনন্দের প্রকাশ। অন্তঃস্বচ্ছতায় ও ঔজ্জ্বল্যে এই আনন্দ-বিশ্ব উদ্ভাসিত। আনন্দরূপ বিশ্ব দেয় ব্রহ্মানন্দের সন্ধান— আনন্দস্নাত বিশ্বের ধ্যানে ব্রহ্মানন্দের প্রতিষ্ঠা। আনন্দ-সাধনার প্রাপ্তি ব্রহ্ম। আনন্দসাধনার বৈশিষ্ট্য এই যে আনন্দই সাধনা, আনন্দই সাধ্য। বিশ্বদৃশ্যের আনন্দমূর্তিকে অবলম্বন করেই আনন্দস্বরূপকে প্রাপ্ত হই। আনন্দ দেয় অমৃত। আত্মানন্দের সঙ্গে সব আনন্দের যোগ আছে বলেই সকল আনন্দের ভেতর আত্মানন্দকে পাই। আত্মানন্দের ভেতরে সব আনন্দের নির্যাসকে দেখি। আনন্দসংবেদনের দুটি স্তর। একটি বিশ্বের সকল বস্তুর ভেতর দিয়ে আনন্দের অনুভূতি। স্থূলে, সূক্ষ্মে ও কারণ-সত্তায় এই আনন্দ বিদ্যমান। অন্তরের সূক্ষ্ম সংবেদনা যত বিকশিত হয়, ততই আনন্দের সূক্ষ্মবিকাশ অনুভব

করি। দ্বিতীয়টি কম্পন ও স্পন্দন থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দের আনন্দ মাত্র রূপ অনুভূতি। আনন্দ এখানে ঘনীভূত। এই অনুভূতি শ্রেষ্ঠতম অনুভূতি। আনন্দ এখানে শুধু রস নয়, রসঘন।

আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম

উপনিষদের তত্ত্বের সুস্পষ্ট ধারণার জন্য ব্রহ্ম, আত্মা ও পরমাত্মা শব্দ তিনটির সঠিক অর্থ জানা আবশ্যক। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বৃহৎ বা ব্যাপক হলেও তাকে প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে সকল অবকাশের আশ্রয়রূপে গ্রহণ করা হয়। এই জন্য তাঁর স্বরূপের মানসিক ধারণা হতে পারে না। শ্রুতি বলেছেন, 'মন যাকে মনন করতে পারে না,' তাঁকে আশ্রয়রূপেও কল্পনা করা যায় না, কারণ তিনি সম্বন্ধের অতীত। কাল ও দেশের অতীত তত্ত্ব। নিরুপাধিক সন্মাত্রস্বরূপ। তিনি কিছুরই কারণ নন। দ্বৈতের কোন ভাণ তাতে নেই। সৃষ্টির উদ্গমও নেই।

ব্রহ্ম ভিন্ন যখন আর কোনও তত্ত্ব স্বীকৃত হয় না, এ জন্য বলতে হয়—এ বিশ্ব তাঁরই প্রকাশ, তিনি এর অন্তরে অন্তর্যামী। এ কথা না বললে—ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু থেকে বিশ্ব রচনা কল্পনা করতে হয়। তাতে ঔপনিষদিক তত্ত্ববোধে বাধা হয়, ব্রহ্মের বিরাটতত্ত্বের ব্যাঘাত হয় ও অপরিচ্ছন্ন স্বভাবের হানি হয়। সৃষ্টির দিক্ দিয়ে তিনি সকল কারণের কারণ, তিনি বিশ্বপ্রাণ,

বিশ্বপ্রজ্ঞা। তাঁর থেকে পৃথক হয়ে বিশ্বের কোন অস্তিত্ব নাই। এইভাবে তাঁকে পরমাত্মা বা ঈশ্বর বলা হয়। পরমাত্মা বিশ্বের অন্তরে থেকে বিশ্বকে দীপ্ত ও নিয়মিত করেন। তিনি বিশ্বাত্মা, বিশ্বকর্তা, বিশ্বনিয়ন্তা। ব্রহ্ম উপাধি গ্রহণ করে, উল্লসিত হয়ে দেশ কালে বিশ্বরূপে বিবর্তিত হন। ঈশ্বর বা পরমাত্মা ব্রহ্মের সগুণ মূর্তি। বিরাটের অন্তরে তিনি অন্তর্যামী। মর্ত্যলোকে ও অমৃতলোকে তিনি অধিবাসী। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ বিশ্ব তাঁর সত্তায় সত্তাবান্। তাঁর আলোয় আলোকিত। বিশ্বের অন্তর হতে শান্ত দীপ শিখার ন্যায় বিশ্ব প্রকাশিত করেন।

পরমাত্মার অবস্থিতি সর্বত্র। আত্মার অবস্থিতি অন্তরে। এ অর্থে আত্মা শব্দ জীবাত্মাবাচক। কিন্তু এ অর্থ ভিন্ন আত্মা শব্দকে ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহার করা হয়।

উপনিষদের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম আত্মা হতে অভিন্ন। আত্মা যখন 'সত্যস্য সত্যম্' তখন তাঁর স্বরূপকে ব্রহ্মরূপে বুঝতে হবে। শ্রুতিতে এ ব্যবহার সুস্পষ্ট। আত্মা হৃদ্‌নিবাস হলেও অন্তর হতে ভিন্ন। অন্তরস্থ হয়েও তিনি অন্তরের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হন না। তাঁর সার্বভৌমিক স্বরূপ কখনও লুপ্ত হয় না। এই নিরুপাধিক স্বরূপে তিনি ব্রহ্ম হতে অভিন্ন। ব্রহ্ম উপাধি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পরমাত্মারূপে, আত্মারূপে প্রতিভাত হন। বস্তুতঃ পরমাত্মা ও আত্মা স্বরূপে ব্রহ্ম।

আত্মার একত্ব

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদে আত্মার একত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। একই আত্মবস্তু সকল পদার্থে অনুগত। আত্মভিন্ন হয়ে কারুরই স্বাধীন সত্তা নেই বলে আত্মসত্তা সর্বত্রই অখণ্ডরূপে প্রতিভাত। যেমন শঙ্খধ্বনিকে শঙ্খ বাদ দিয়ে গ্রহণ করা যায় না, যেমন বীণার ঝঙ্কারকে বীণা বাদ দিয়ে গ্রহণ করা যায় না, তেমনি এই বিশ্বের বিকাশকে—যাবতীয় বস্তুসমূহকে—আত্মসত্তা থেকে ভিন্নরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ তারা সবই আত্মসত্তার প্রকাশ। ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হলেও তারা আত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। যেমন অগ্নি হতে বহির্গত তেজ, ধূম, শিখা, অগ্নিরই রূপ, তেমনি এই বিশ্ব, তার অনন্ত সম্ভার, (নামরূপ ক্রিয়া) ব্রহ্মেরই রূপ। এই বিশ্ব শ্বাসপ্রশ্বাসের মত স্বতঃই ব্রহ্মসত্তা থেকে উদ্ভূত হয়ে তাতেই প্রকাশিত হচ্চে। এক প্রশান্ত স্থিতি থেকে লীলায়িত ঢেউএর মত নামরূপ ক্রিয়াত্মক জগৎ উৎপন্ন হচ্ছে। ব্রহ্মের বিবর্ত এই জগৎ। এই বিশ্ববৈচিত্র্য ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। কি সৃষ্টিতে, কি স্থিতিতে, কি সংহারে কোন কালেই এই বৈচিত্র্য ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়। আত্মা স্বত স্থিত, স্বতস্ফূর্ত।

ভুমা-বিদ্যা

নারদ সনৎকুমার সংবাদ ছান্দোগ্য উপনিষদে গভীর রহস্য-পূর্ণ। নারদ নানা বিদ্যায় বিভূষিত হয়েও তৃপ্তি লাভ করতে

পারেন নি। তিনি ঋষি সনৎকুমারের কাছে গিয়ে বলেছিলেন "ভগবন, আমি মন্ত্রবিদ্, আত্মবিদ্ নই। শুনেছি শুধু আত্মবিদেরাই শোক থেকে মুক্ত। আমি শোকমগ্ন, আমাকে শোক থেকে মুক্ত করুন।" সনৎকুমার উত্তর করলেন্ "ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই।"

সনৎকুমার তুটী শব্দ ব্যবহার করেছেনঃ ভূমা ও অল্প। ইন্দ্রিয় গ্রাম যে সব বিষয় উপস্থিত করে, তাকেই অল্প বলা হয়। আমরা দেখি, শুনি; কোন বিষয় বিশেষক নিয়ে আমাদের জ্ঞান, সমগ্র সত্তাকে নিয়ে নয়। এ জ্ঞান অল্পেরই জ্ঞান। ভূমা জ্ঞান অসীমেরই জ্ঞান। অল্পের জ্ঞান অশোক হবার কোন সন্ধান দেয় না। এইজন্যে তিনি নারদকে অসাধারণ জ্ঞানের কথা বলেছিলেন। কিন্তু সহসা বলেন নি। বুদ্ধিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর তত্ত্বে উপনীত করে শেষে তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। যা সর্ব উপাধিশূন্য, নির্বিশেষ, তাই ভূমা। ভূমা শব্দের অর্থ বিরাট, অপরিচ্ছিন্ন। সনৎকুমারের ভাষায় এ ভূমার জ্ঞান এমনি যে, এখানে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না। যেখানে অন্যকে দেখা যায়, শোনা য়ায়, জানা যায়, তাই অল্প। যা ভূমা, তাই অমৃত; যা অল্প, তাই মর্ত্য। নারদ প্রশ্ন কর্লেন "ভগবন, এ ভূমা কিসে প্রতিষ্ঠিত?" সনৎকুমার উত্তর দিলেন, "মহিমায়"। সম্বন্ধশূন্য হয়ে, অতিমানস অনুভূতিতে এ মহিমা পরিস্ফুট। এ জ্ঞানের ভেতর কোন সম্বন্ধ নেই বলেই

এই ভূমাকে অন্তরে, বাহিরে, চতুর্দিকে, উর্ধ্বে, অধে কল্পনা করা হয়েছে। পরাজ্ঞান বিশ্ববোধকেও অতিক্রম করে। থাকে শুধু বোধিসত্তা। এখানে আত্মক্রীড়া, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ অবস্থার প্রাপ্তি।

ভূমার অনুভূতির দুটি স্তর। অন্তরে বাহিরে এক অখণ্ড প্রকাশে এর পরিচিতি। বিশ্বময় অবকাশে এর পরম স্ফূর্তি। সেই অবকাশ ও স্ফূর্তির লয় যেখানে—সেখানে ভূমার স্বরূপ প্রতিষ্ঠা।

জ্ঞানীর আত্মাতেই গভীর রতি। জ্ঞানী বিষয়ের আবরণমুক্ত হয়ে বিচরণ করে। সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল স্পৃহা, চঞ্চল আকর্ষণ হতে মুক্ত হয়ে আত্মস্বারাজ্য প্রাপ্ত হয়। জীবত্বের ক্ষুদ্রতা ও অল্পতা, ঈশ্বরত্বের বিরাটত্ব ও অপ্রতিহত শক্তির অধিকার থেকে জ্ঞানী মুক্তাত্মার অনুপম স্বাধীনতার আনন্দে তৃপ্ত হয়। দ্বিতীয় কিছুই থাকে না—থাকে শুধু উদার অসীম প্রশান্তি, সকল উপাধির বন্ধন মুক্তি, দুঃখ থেকে মুক্তি, বিশ্ববিজ্ঞান থেকে মুক্তি। এ মুক্তি আনন্দ স্বরূপ, শূন্য নয়। আনন্দ, কেন না পূর্ণসত্তার স্বরূপ বিকাশ এখানে। সকল উপাধির লয়ে আত্মস্বারাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

উপনিষদ ব্রহ্মকে নানা দিক থেকে দেখেছে, তার কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। এবার দেখব সৃষ্টির ভেতর তিনি কি ভাবে অবতরণ করেন, কি সম্বন্ধ তাঁর দেশ ও কালের সঙ্গে।

দেশ, কাল ও ব্রহ্ম

বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনে দেশ, কাল ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে চমৎকার কথা পাই। সহজ হবে বলে নীচে সেই কথোপকথনের কিছুটা তুলে দিলুম।

গার্গী—এই পৃথিবীর ও অন্তরীক্ষ লোকের মধ্য, ঊর্ধ্ব ও অধঃ দেশ কার দ্বারা ব্যাপ্ত।

যাজ্ঞবল্ক্য—আকাশের দ্বারা।

গার্গী—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কার দ্বারা ব্যাপ্ত ?

যাজ্ঞবল্ক্য—কালের দ্বারা। কাল আবার আকাশের দ্বারা ব্যাপ্ত।

গার্গী—আকাশ কার দ্বারা ব্যাপ্ত ?

যাজ্ঞবল্ক্য—অক্ষয়, অবিনাশী ব্রহ্মের দ্বারা, যিনি স্থূল নন, সূক্ষ্ম নন, অজর অমৃত।

যাজ্ঞবল্ক্য এখানে একটি গভীর প্রশ্নের অবতারণা করেছেন—দেশ ও ব্রহ্ম নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কালের কথাও এসে গেছে। দেশে হয় সব বস্তুরই অবস্থিতি। কালে হয় ঘটনার পারম্পর্য। এ থেকে বোঝা যায় যে স্থিতি আকাশকে অবলম্বন করে এবং গতি কালকে অবলম্বন করে। কাল যেখানে নেই সেখানে গতিকে বুঝিনে। একথা স্পষ্ট। কিন্তু উপনিষদে আকাশকে যত বড় করে দেখা হয়েছে, কালকে তত বড় করে নয়। যাকে অবলম্বন করে সব বস্তুর পরিস্থিতি হয়, তার ভেতর স্থিতিরূপ যতটা পরিস্ফুট অন্যত্র

ততটা নয়। এই আকাশই ব্রহ্মবোধের রূপ। গতি ও স্থিতির ভেতর কোনটা প্রাথমিক তা নিয়ে অনেক তর্ক থাকলেও সাধারণভাবে বুঝি স্থিতিকে অবলম্বন করেই গতি থাকে। আকাশ তাই পরম স্থিতি নয়—অনন্ত আকাশ যাতে অবস্থিত, তাই ব্রহ্ম। এই তত্ত্ব ফুটে উঠেছে যাজ্ঞবল্ক্যের কথায়।

পরমকারণসত্তা

ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি আখ্যায়িকা আছে। ঋষি আরুণি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতু গুরুগৃহ থেকে ফিরে এলে তাকে প্রশ্ন করলেন "যাকে জানলে সব জানা যায় তাকে কি জেনেছো?" পুত্র উত্তর দিলেন, "না"। তখন আরুণি পুত্রকে উপদেশ দিলেন কার্য কারণ তত্ত্ব নিয়ে। কার্য কারণের বিকার, কারণ হতে ভিন্ন নয়। কার্য-গুলির আকার ভিন্নপ্রকারের বলেই কার্যকে কারণাপেক্ষা ভিন্ন বলেই মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারণ হতে কার্যের সত্তা পৃথক নয়। ঘট কার্য, মৃত্তিকা কারণ। দেখতে দুইই ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপে ঘট ও মৃত্তিকা আকারভেদ মাত্র। বিকার সত্য নয়, সত্য হল কারণ। স্বর্ণ কারণ; বলয়, মুকুট, বিকার মাত্র।

কার্যকারণের এই দৃষ্টি অবলম্বন করে আরুণি বল্লেন, এই বিশ্ব কার্য, ব্রহ্ম কারণ। জগৎ ব্রহ্মেরই রূপ। কার্যরূপে

O. P. 99—৬

এর নাম, রূপ, ক্রিয়া আছে। কারণ রূপে এই ব্রহ্ম। নাম, রূপ, ক্রিয়া বিকার মাত্র। সৃষ্টি কারণের কার্যানুপ্রবেশ। সৃষ্টির ব্রহ্ম ভিন্ন কোন কারণ নেই বলে তাকে অদ্বিতীয় বলা হয়েছে।

সাধারণতঃ কারণ বলতে দুটী কারণ বুঝি, উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা, নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার। উপাদানকে বিবিধ ভাবে সন্নিবেশিত করে নানা রূপ দেয় কুম্ভকার। জগৎস্থষ্টিতে উপনিষদ কখনও দুই পদার্থ স্বীকার করে না। ব্রহ্ম ভিন্ন জগতের কোন কারণ নেই। ব্রহ্মই উপাদান কারণ, ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ। জগত ব্রহ্মেরই বিবর্ত। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, অথচ সৃষ্টিতে তাঁর স্বরূপের কোন পরিণতি হয় না। সৃষ্টিতে তিনি বহুরূপে প্রকাশিত হলেও তাঁর স্বরূপের বিচ্যুতি হয় না। তিনি সৃষ্টির পূর্বেও যেমন থাকেন, সৃষ্টির পরেও তেমনি থাকেন। তাঁর স্বরূপে কোন পরিবর্তন নেই। স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন হয়েও তিনি সৃষ্টিতে বহুরূপে প্রকাশিত। গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে একথা আরও স্পষ্ট হয়েছে। গার্গী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হয়ে জনকের সভায় উপস্থিত হন। সেখানে তিনি কার্যকারণ সূত্রকে অবলম্বন করে স্থূল হতে সূক্ষ্ম সত্তার অবতারণা করেন। কারণ সত্তা কার্যসত্তা থেকে ব্যাপক ও সূক্ষ্ম। এটা প্রত্যক্ষ। ঘট কার্য, মৃত্তিকা কারণ, ঘট থেকে মৃত্তিকার সত্তা ব্যাপক। পৃথিবীর কারণ জল, জলের কারণ অগ্নি, অগ্নির কারণ বায়ু, বায়ুর কারণ অন্তরীক্ষ। এই

ভাবে স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হই কারণ সত্তার অন্বেষণে। যাজ্ঞবল্ক্য অন্তরীক্ষ লোকেরও সূক্ষ্মতর আশ্রয়ের কথা বলতে লাগলেন। অন্তরীক্ষ লোক গন্ধর্ব লোকের দ্বারা, গন্ধর্বলোক আদিত্য লোকের দ্বারা, আদিত্য লোক নক্ষত্রলোকের দ্বারা, নক্ষত্রলোক দেবলোকের দ্বারা, দেবলোক ইন্দ্রলোকের দ্বারা, ইন্দ্রলোক প্রজাপতিলোক দ্বারা ব্যাপ্ত। এই প্রজাপতিলোক পরিব্যাপ্ত সূক্ষ্মতর ব্রহ্মলোকের দ্বারা। ব্রহ্মলোকই পরম সূক্ষ্ম। গার্গী জিজ্ঞাসা করলেন, এই ব্রহ্মলোক কোথায় অবস্থিত? যাজ্ঞবল্ক্য এ প্রশ্নের গভীরতা উপলব্ধি করে গার্গীকে আর প্রশ্ন করিতে নিষেধ করলেন কারণ ব্রহ্ম কার্যকারণ শৃঙ্খলার অতীত।

কথা উঠতে পারে তিনি পূর্ণ হয়েও কি করে, বিশ্ব সৃষ্টি করেন? এক হয়েও কিরূপে বহুরূপে প্রকাশিত হন? শ্রুতি বলেন—ব্রহ্মের একটি শক্তি আছে, 'মায়া'। মায়াকে অবলম্বন করে তিনি এক হয়েও বহুরূপী হন। "ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহুরূপ গ্রহণ করেন।"

মায়া

মায়া ব্রহ্মের সৃজন শক্তি। তিনি এ শক্তিকে অবলম্বন করেই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। যে শক্তির দ্বারা অসীম থেকে সীমার উৎপত্তি, সেই শক্তিই মায়া। সৃষ্টি অসীমের সীমায় প্রকাশ, দেশ কাল রহিত বস্তুর দেশ কালের ভেতর বিকাশ।

এ শক্তিকে অবলম্বন করে তিনি পরম কারণ, কারণের কারণ। শক্তি তারই চেতনায় বিধৃত হয়ে সৃজন করে। এই জন্যে সৃষ্টিতে আছে আনন্দের উন্মেষ। সৃষ্টিতে আনন্দের কোন স্বরূপচ্যুতি হয় না। অথচ তার স্ফূর্তি হয় অনন্তরূপে। সৃষ্টি তাঁরই সঞ্চার। যে শক্তি এই একরূপ তত্ত্বকে বহুরূপে দেখায় সে বিস্ময়ের বস্তু, সে শক্তি কৌতুকময়ী। সৃষ্টি ব্রহ্মশক্তির কৌতুকক্রীড়া। আনন্দের সঞ্চার ভিন্ন, অন্তর উন্মেষ ভিন্ন এর কোন কারণ নেই—থাকতে পারে না। পূর্ণের বিশ্বরূপে প্রকাশ, তাঁর খেলা বা লীলা। লীলার কৌতুকময়ী শক্তিই মায়া। এর স্বরূপ রহস্যপূর্ণ। পূর্ণকে, অখণ্ডকে কেমন করে খণ্ডরূপে দেখায়, বুদ্ধির কাছে তা বিস্ময়কর। মায়ার কিন্তু কার্য এই। এ রহস্য চিরকাল বিস্ময়াবৃত।

ব্রহ্ম নিজ স্বরূপে পূর্ণ হলেও তার ভেতর বিশ্ব বিকাশের সঞ্চার আছে। এই সঞ্চারের দ্বারা তিনি কোন কিছু অববম্বন না করেই জগৎ সৃষ্টি করেন। একদিকে তিনি যেমন শান্ত, অপর দিকে তিনি তেমনি সকল ক্রিয়া ও শক্তির আশ্রয়। উদার অবস্থিতির ভেতর গতির স্ফূর্তি। ঘনীভূত সত্তার ভেতর অনন্ত মূর্ত প্রকাশ। ব্রহ্ম শক্তির অতীত হয়েও শক্তির আশ্রয়। মায়া এই শক্তি। মায়াকে অবলম্বন করে তাঁর বিশ্ব-বিভূতির বিকাশ—জ্ঞানে, রসে, শক্তিতে।

সংবর্গ বিদ্যা

ব্রহ্মশক্তি যে জগতের মূল থেকে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেছেন, তা সংবর্গ বিদ্যায় সুস্পষ্ট হয়েছে। এ বিদ্যার বিষয় ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে। এই বিদ্যা বিশ্বকে দুই ভাগে বিভাগ করেছে—অন্তর্বিশ্ব ও বহির্বিশ্ব। এ দুই বিশ্বই ক্রিয়াশীল। অন্তঃশক্তি 'প্রাণ', বহিঃশক্তি 'বায়ু'। অগ্নি যখন নির্বাপিত হয়, তা লীন হয় বায়ুতে। সূর্য যখন অস্তমিত হয়, তাও বায়ুতে হয় লীন। এ হল শক্তির অধিদৈব ভাব।

যখন পুরুষ নিদ্রিত হয়, তখন বাক্‌শক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, চক্ষু, শ্রোত্র, মন—সকলই প্রাণে প্রবেশ করে। অন্তর্জগতে যা প্রাণ, বহির্বিশ্বে তাই বায়ু। প্রাণ ও বায়ু একই শক্তির দুই বিকাশ। এর থেকে বোঝা যায় যে শক্তি বিশ্বের বিধৃতি। প্রাণ ও বায়ু শক্তির রূপ বিশেষ। এই শক্তি 'মায়া'। এই শক্তি সকল বিশ্বে বিরাজ করে। সেই প্রাণ, সেই বায়ু, সেই বিশ্বাধার। ব্রহ্মতে ওতপ্রোতভাবে সে বিদ্যমান। বিশ্ব এই শক্তির পরিণতি। এই শক্তিকে সংবর্গবিদ্যায় প্রাণ ও বায়ু বলা হয়েছে। মায়া ছাড়া জগতে কিছুর কোন ক্রিয়া হয় না। মায়া বিশ্ব শক্তি।

অন্তর্যামী বিদ্যা

ব্রহ্ম অন্তর্যামী পুরুষ, তাঁর বিশ্বরূপ আছে। তিনি অন্তরের অন্তর্যামী—বিশ্বেরও অন্তর্যামী। ইনি যখন অন্তরে থেকে

নিয়মন করেন তখনই হয় ইহার অধ্যাত্মরূপ। শ্রুতি বলেছেন—

"যিনি প্রাণে থেকে প্রাণের অভ্যন্তরে বর্তমান, প্রাণ যাঁকে জানতে পারে না, প্রাণ যাঁর শরীর, তিনি অন্তর্যামী অমর আত্মা।"

"যিনি বাক্যে থেকে বাক্যের অভ্যন্তরে রয়েছেন, যাঁকে বাক্য জানতে পারে না, বাক্য যাঁর শরীর, তিনি অন্তর্যামী, অমর আত্মা।"

"যিনি চক্ষুতে থেকে চক্ষুর অভ্যন্তরে রয়েছেন, চক্ষু যাঁকে জানতে পারে না, চক্ষু যাঁর শরীর—তিনি চক্ষুর অন্তর্যামী, অমর আত্মা।"

"যিনি কর্ণে থেকে কর্ণের অভ্যন্তরে রয়েছেন, কর্ণ যাঁকে জানতে পারে না, কর্ণ যাঁর শরীর—তিনি কর্ণের অন্তর্যামী, অমর আত্মা।"

"যিনি মনে, বুদ্ধিতে ও বীর্যতে থেকে, মন, বুদ্ধি ও বীর্যের অভ্যন্তরে রয়েছেন, যাঁকে মন, বুদ্ধি ও বীর্য জান্‌তে পারে না, মন বুদ্ধি ও বীর্য যাঁর শরীর—তিনি অন্তর্যামী, অমর আত্মা।"

"যিনি স্পর্শেন্দ্রিয়ে থেকে স্পর্শেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে রয়েছেন, যাঁকে স্পর্শেন্দ্রিয় জানতে পারে না, স্পর্শেন্দ্রিয় যাঁর শরীর, তিনি স্পর্শেন্দ্রিয়ের অন্তর্যামী, অমর আত্মা।"

তাঁর অধিভূত রূপের প্রকাশ হয়, ভূত পদার্থের সংস্পর্শে। যিনি শব্দ-স্পর্শ-রূপাদির অভ্যন্তরে আছেন, অথচ শব্দস্পর্শাদি ভূতসকল যাঁকে জানতে পারে না, ভূত সকল যাঁর শরীর— তিনি ভূতসকলের অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

তাঁর আধিদৈবিক রূপের কথা এখন বলা হচ্ছে। তিনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, হ্যুলোকে, সূর্য, চন্দ্রমা, তারকা, আকাশ, আলোক, অন্ধকারে থাকাতেও তারা তাঁকে জানতে পারে না। এরা তাঁর শরীর, তিনি এদের অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

একই আত্মা অন্তর্যামী রূপের ব্যষ্টিতে ও সমষ্টিতে আছে। তিনি আমাদের অন্তরে অন্তর্যামী, বিশ্বের অন্তরে অন্তর্যামী। সূক্ষ্ম ও দিব্যতে তিনি অন্তর্যামী, ব্যষ্টির অন্তর্যামী, সমষ্টির অন্তর্যামী।

চিত্ত প্রদীপ্ত হলে আমরা এই অন্তর্যামী পুরুষকে অনুভব করতে পারি। প্রথমে অন্তঃসত্তায় তাঁকে উপলব্ধি করি। অবশেষে স্থূল ও সূক্ষ্ম বিশ্বে তাঁকে অনুভব করি। সংবর্গ বিদ্যা ও অন্তর্যামী বিদ্যা ব্রহ্মের বিশ্বরূপের সঙ্গে আমাদের

পরিচয় করিয়ে দেয় (cosmic divine)। কিন্তু এতেই তাঁর স্বরূপের শেষ হয় না। তাঁর নিজের স্বরূপে তিনি বিশ্বাতীত (transcendent divine)।

মধু বিদ্যা

বৃহদারণ্যকোপনিষদে মধুবিদ্যার কথা বলা হয়েছে। বিশ্বের সব পদার্থের আনন্দরূপ আছে। সকলের ভেতরই ব্রহ্মানন্দের স্ফূর্তি হয়। এই আনন্দ থাকে ওতপ্রোত-ভাবে। মধুবিদ্যায় বিশ্বের একটি আনন্দরূপের ছবি দেওয়া হয়েছে।

এ শুধু আনন্দের আনন্দমাত্র অনুভূতি নয়, আনন্দের উৎসব।* আনন্দে বিশ্ব উদ্বেলিত। সকলে আনন্দ, সকলেই অন্যের আনন্দ আস্বাদ করে। প্রত্যেকে হয় প্রত্যেকের আনন্দ।

---

* "পৃথিবী মধু, ভূতসকল পৃথিবীর মধু। অপ মধু, ভূতসকল মধু। অপ ভূতসকলের মধু, ভূতসকল অপের মধু। অগ্নি মধু, ভূতসকল মধু, অগ্নি সকল ভূতের মধু, ভূতসকল অগ্নির মধু। বায়ু মধু, ভূত সকল মধু; বায়ুসকল ভূতের মধু, ভূতসকল বায়ুর মধু। আদিত্য মধু, ভূতসকল মধু; আদিত্যসকল ভূতের মধু, ভূতসকল আদিত্যের মধু। দিক মধু, ভূতসকল মধু; দিকসকল ভূতের মধু; ভূতসকল দিকের মধু। চন্দ্র মধু, ভূতসকল মধু; চন্দ্র ভূতসকলের মধু, ভূতসকল চন্দ্রের মধু। বিদ্যুত মধু, ভূতসকল মধু; বিদ্যুত ভূতসকলের মধু; ভূতসকল

এ বিশ্বময় আনন্দবোধ ব্রহ্মজ্ঞানের ভূমিকা। ব্রহ্মানন্দের বিশ্বাতীত স্বরূপের অনুভূতির পূর্বে এরূপ অবস্থা সাধক লাভ করে থাকেন। এখানেও অধ্যাত্ম, আধিদেব, অধিভূত বিশ্বের অনুভূতি হয়। উপনিষদের দৃষ্টি খুলে গেলে এই আনন্দকেই আমরা সর্বত্র অনুভব করি, কি অন্তর সত্তা, কি বিশ্বসত্তা, কি বিশ্বাতীত সত্তায়। মধুবিদ্যা আনন্দ ছন্দে পূর্ণ। এই ছন্দে চিত্ত বিশ্বময় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বিশ্বময় আনন্দ মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। আনন্দ উদ্ভাসিত সৃষ্টির সব স্তরে ও ছন্দে। মধুবিদ্যা এই উদ্বেল আনন্দের রূপ সঞ্চার করে। এই বিদ্যায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে প্রত্যেক পদার্থের অন্তরে এক তেজোময় পুরুষ আছেন, যিনি অমৃতময়। তিনি অন্তরে আছেন বলে সকলে তেজোময় ও আনন্দময়। পৃথিবীতে তিনি অন্তর্নিহিত আছেন বলেই পৃথিবী আনন্দময়, শরীর তেজোময়, আনন্দময়। অপে তিনি বর্তমান, তাই অপ অমৃতময়। রেতে তিনি বর্তমান বলেই রেত তেজোময় অমৃতময়। বায়ুতে তিনি আছেন তাই বায়ু তেজোময় ও অমৃতময়। প্রাণে তিনি আছেন বলেই প্রাণ অমৃতময়।

বিদ্যুতের মধু। মেঘ মধু, ভূতসকল মধু; মেঘসকল ভূতের মধু, ভূত সকল মেঘের মধু। আকাশ মধু, ভূতসকল মধু; আকাশসকল ভূতের মধু, ভূতসকল আকাশের মধু। ধর্ম্ম মধু, ভূতসকল মধু; ধর্ম্মসকল ভূতের মধু, ভূতসকল ধর্ম্মের মধু; সত্য মধু, ভূতসকল মধু; সত্য ভূত সকলের মধু, ভূতসকল সত্যের মধু। মানুষ মধু, ভূতসকল মধু; মানুষ ভূতসকলের মধু, ভূতসকল মানুষের মধু। আত্মা মধু, ভূতসকল মধু, আত্মাসকল ভূতের মধু; ভুতসকল আত্মার মধু।"

আদিত্যে, দিকে, চন্দ্রে, বিদ্যুতে, মেঘে, আকাশে—তিনি আছেন বলেই তারা তেজোময়, অমৃতময়; তেমনি চক্ষু, কর্ণ, মন, ত্বক্, শব্দ, হৃদয়ে আছেন বলেই তারা দীপ্তিময় ও অমৃতময়।

পদার্থের (ভূতসকলের) অন্তরে এক দীপ্তি আছে; প্রত্যেক অধ্যাত্ম শক্তির অন্তরে আছে এক দিব্য চেতনা। চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে ও বাইরে এরূপ দিব্য আনন্দের পরিচয়।

তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বল্লীর শেষদিকে স্থূল ও সূক্ষ্ম বিশ্বের আনন্দের কথা বলা হয়েছে। আনন্দ তত্ত্ব হলেও বিশ্বের সকলেই ব্রহ্মানন্দ অনুভব করতে পারে না। সৃষ্টিতে প্রত্যেক পদার্থ আনন্দের মাত্রাকে অবলম্বন করে বাঁচে। স্থূল বিশ্বের আনন্দ ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে স্থূলের অন্তরে উপলব্ধ হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে—এ আনন্দের পর্যায় আছে। মানুষের আনন্দ, গন্ধর্বের, দেবতার, পিতৃগণের, আজানজ[১] দেবগণের, কর্মদেবগণের[২], ইন্দ্রের, বৃহস্পতির, প্রজাপতির, হিরণ্যগর্ভের আনন্দ সূক্ষ্মরূপের আরোহক্রম।

সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর স্তরে আনন্দের সঞ্চরণ অধিকতর। সত্তার স্বচ্ছতা ও নমনীয়তা ও ব্যাপকতার সাথে আনন্দের নিবিড়

১। যারা স্মৃতিবিধান অনুযায়ী কর্ম করে' দেবত্ব প্রাপ্ত হন।
২। যারা বেদবিধান অনুযায়ী কর্ম করে' দেবত্ব লাভ করেছেন।

সম্বন্ধ। চিত্তের স্বচ্ছতায় এরূপ বিশ্বের প্রকাশ। এ কল্পনা নয়—সত্য দৃষ্টি। চিতি পুরুষের (Psychic Self) দৃষ্টিতে এ আনন্দ বিশ্ব উদ্ভাসিত। প্রত্যেক বস্তুর আনন্দ রূপের এখানে পরিচয়।

বৈশ্বানর বিদ্যা

সত্যের বিশ্বমূর্তির কথা আগেই বলেছি। তার বিশ্বরূপের ভাবনা বৈশ্বানর বিদ্যায় আরও পরিষ্কার হয়েছে। এই বিশ্বরূপ এক একটি অবয়বে বদ্ধ নয়। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহরাশি—সকলই তাঁর রূপ হলেও ব্যষ্টিরূপে এরা তাঁর বিশ্বমূর্তি নয়। সমগ্র বিশ্ব বিরাটের রূপ। এই পুরুষ প্রাণে, বাকে, মনে, বিজ্ঞানে প্রকাশিত, তাঁর সত্তা গ্রহমণ্ডলে ব্যাপ্ত। তিনি সর্বভূতস্থ, সর্বময়। এই বৈশ্বানর পুরুষের ভাবনা শুধু বিশ্বেই আবদ্ধ নয়। তাঁর ভাবনা ব্যক্তিবিশেষের ওপোরে হতে পারে। মানুষ তার ইন্দ্রিয় ও শক্তির সঙ্গে আধিদৈবিক শক্তি অভিন্ন দেখে নিজেকে বৈশ্বানর পুরুষ রূপে ভাবনায় লিপ্ত হতে পারে। ভাবনা ব্রহ্ম-দৃষ্টির উৎকর্ষ সাধন করে। ব্রহ্ম-ভাবনায় সিদ্ধি লাভ করতে হলে সর্বত্র ব্রহ্ম সত্তার অনুভব হওয়া দরকার। এই ব্রহ্মানুভূতির জন্যে বুদ্ধির সাধারণ সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্যে জগতে যেমন ব্রহ্মদৃষ্টি স্থাপন করা দরকার, তেমনি দরকার আমাদের সত্তার ব্যাপক দৃষ্টি স্থাপন করা। দু'য়ের ভেতর একটি ঐক্য স্থাপন করাও আবশ্যক। ব্রহ্মবিজ্ঞান পূর্ণরূপে স্ফূর্ত হবার

পূর্বে প্রত্যেক পদার্থে অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তার পরিচয় আবশ্যক। এরূপ দৃষ্টি মানস দৃষ্টির অতীত। বিশ্বের অন্তর রূপের পরিচয়। এরূপ দৃষ্টি স্থাপন করতে পারলে স্বাভাবিক সঙ্কীর্ণতা থেকে মানুষ মুক্ত হয়। ব্রহ্মদীপ্তিতে অন্তর উজ্জ্বল হয়ে অন্তরে বাহিরে—এক দিব্য জ্ঞান লাভ করে। এক স্বচ্ছ জ্যোতির্ম্ময় সত্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, জ্ঞানে পূর্ণ হয়। বিশ্বময় একই সত্তার হয় অনুভূতি—জ্ঞানদীপ্ত, ভাস্বর।

হিরণ্যগর্ভ

সৃষ্টিতে অনেক স্তর থাকলেও একটা শৃঙ্খলা আছে। শৃঙ্খলা-সূত্র নিয়ে সমষ্টিবোধের বিকাশ। এই সমষ্টিবোধ অব্যক্ত বোধ।

কিন্তু সমষ্টিবোধ ব্যষ্টিরূপে প্রকাশিত। ব্যষ্টির বিকাশ সৃষ্টির একটি স্তর। এই বিকাশের প্রথম পুরুষ হিরণ্যগর্ভ। এঁরই সঙ্গে ব্যষ্টিজীবজগতের (world of personality) সম্বন্ধ। সৃষ্টির অব্যক্ত ও ব্যক্ত রূপ আছে। ব্যক্ত রূপই ব্যষ্টিরূপ। এই ব্যষ্টিজগতের ভেতর আছে জীবজগৎ। জীবজগৎ চেতনাকে কেন্দ্র করেই বিকশিত। হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টির সঙ্গে ব্যক্তি-জগতের স্ফুরণ। হিরণ্যগর্ভ মুখ্য জীব, অন্য জীবেরা গৌণ।

একই অক্ষর পুরুষ সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভরূপে ও স্থূল বিরাটরূপে ব্যক্ত। সৃজনের সঞ্চারে শান্ত আত্মার ভেতর উদ্বেল অবস্থার

সূচনা। অব্যক্তের ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত হবার উপক্রম। অব্যক্তের প্রথম প্রকাশ হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্মরূপে অভিব্যক্ত; স্থূলরূপের অভিব্যক্তিকে বিরাট বলা হয়। হিরণ্যগর্ভ পুরুষের অনুভব সূক্ষ্মরূপেই হয়ে থাকে। উপনিষদে স্থূল সূক্ষ্মজগতের কথা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ বিশ্ব বলতেই স্থূলকে যেমন বোঝায়, তেমনি স্থূলের অন্তরে সূক্ষ্মজগৎকে বোঝায়। সূক্ষ্মের প্রকাশই স্থূল; স্থূলে যা অস্পষ্ট, সূক্ষ্মে তা সুস্পষ্ট। হিরণ্যগর্ভ পুরুষ ব্যষ্টি হলেও —সকলের সাথে অভিন্ন, তাঁর জ্ঞান ও সত্তা সূক্ষ্মে অপ্রতিহত। তাঁর ব্যক্তিত্ব থাকলেও সে ব্যক্তিত্ব সূক্ষ্মজগতে সর্বত্র প্রসারিত। চেতনার ব্যক্তিরূপ অবলম্বন করে সৃষ্টির অপূর্ব প্রকাশ। এই ব্যষ্টিজগতে জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের যে পরিমাণ বিকাশ হবার সম্ভাবনা অন্য কোথাও তা নেই। সৃষ্টিধারার একদিকে চেতনার অস্ফুট বিকাশ, আর এক দিকে স্ফুট বিকাশ। জড়-জগতের চেতনার অস্ফুট বিকাশ থাকলেও তার উপাদান এমন নয় যে সেখানে চেতনা মূর্ত হয়ে বিকশিত হতে পারে। আর ঊর্ধ্বচেতনা সবিশেষ রূপে প্রকাশিত হলেও তাতে ব্যষ্টিত্বের স্ফুরণ হয় না, আকাশের মত সে অপরিচ্ছন্ন। ব্যষ্টিত্বের ভেতর একটা পরিচ্ছন্ন ভাব।

উপনিষদের দৃষ্টিতে চেতনা ভিন্ন সত্তা নেই। তা হলেও সৃষ্টির ঊর্ধ্বে ও অধস্তরে চেতনার একরূপ প্রকাশ নেই। ঊর্ধ্বে চেতনা অমূর্ত হয়েও ক্রিয়াশীল ও সর্বব্যাপী। এখানে ব্যষ্টি সমষ্টি বোধ নেই। অধস্তরে চেতনার অস্ফুট

প্রকাশ, ব্যক্তিত্বে মূর্ত হয়ে প্রকাশিত হয় না। ব্যক্তিত্বের সঞ্চার মনুষ্যজগতেই হয়, এখানে চেতনায় আমি বোধ সুস্পষ্ট। এই আমিত্বের বোধ ব্যক্তিত্বের মূলে। এই ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু প্রকাশ হিরণ্যগর্ভে। অস্পষ্ট জ্ঞান সেখানে নেই। স্মৃতির সমুজ্জ্বলিত প্রকাশে হিরণ্যগর্ভ পূর্ণ। ব্যক্তিত্বের নানা স্তর আছে। জ্ঞানের স্বচ্ছতার তারতম্য নিয়ে স্তর বিভাগ। হিরণ্যগর্ভ প্রথম শরীরী হলেও, তার অন্তরদীপ্তি ব্যষ্টিজগতের সকলের অপেক্ষা অধিক।

হিরণ্যগর্ভ পুরুষ-চেতনার প্রাথমিক ব্যক্তিবোধ। তার সঙ্গে সঙ্গে সকল ব্যষ্টিজীবের সম্বন্ধ আছে, কারণ ইনি হলেন মুখ্য ব্যক্তি। এই সম্বন্ধ প্রত্যক্ষীভূত। কিন্তু ইনি ঈশ্বর নন, ইনিও জীব। সূক্ষ্ম জ্ঞানবিজ্ঞানের ইনি আধার, প্রকাশশীল ও স্বচ্ছ। এঁর ব্যক্তিত্বে চেতনার স্ফুটতর প্রকাশ। কারণ ইনি ব্যক্তিচেতনার মূল আশ্রয়। এঁর বিকাশ হয় সৃষ্টির কোনো কালে, ইনি আদিম পুরুষ নন। আদিমপুরুষের অসৃষ্টব্যক্তিত্ব (uncreated personality) আছে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের অর্থ এই যে তাঁর মত আর কেউ নেই। তিনি সবিশেষ বলেই ব্যক্তি—তাঁকে পুরুষোত্তম বলা যায়। তাঁর ভেতর স্থূল ও সূক্ষ্ম, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট পদার্থ অবস্থান করে। কিন্তু হিরণ্যগর্ভের ব্যক্তিত্ব এরকম নয়, তার জ্ঞান ও শক্তি গৌণ। জীবের অপেক্ষা অধিক হলেও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাঁর সীমা আছে। তিনি তাঁর জীবভাবকে অতিক্রম করতে পারেন না। সত্তাতিশয্যে তাঁর উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছতা, জ্ঞান, শক্তি,

সাধারণ জীবের চেয়ে অনেক বেশী। যোগযুক্ত, জ্ঞাননিষ্ঠ, কল্যাণরত তিনি। ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত। তাই ঈশ্বরীয় জ্ঞানধারার সঙ্গে পরিচিত। এই সব কারণে তাঁকে হিরণ্যগর্ভ বলে—তাঁর অন্তর তেজোময়। সৃষ্টজগতে হিরণ্যগর্ভের স্থান। নিত্য স্ফুরিত জ্ঞান ও কল্যাণে পূর্ণ ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভকে অতিক্রম করেন। হিরণ্যগর্ভ সৃষ্ট, ঈশ্বর নিত্য। প্রলয়ে হিরণ্যগর্ভের লয় হয়, কিন্তু ঈশ্বরের লয় হয় না। সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের নিষ্কলঙ্ক বিকাশ হিরণ্যগর্ভে।

শব্দ ও ব্রহ্ম

উপনিষদে শব্দব্রহ্মের কথা আছে। প্রাচীনকাল থেকে শব্দ ও অর্থের সঙ্গে একটি নিবিড় সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। শব্দ অর্থকে জ্ঞাপন করে। ঘট, পট, মঠ এরা শব্দ ; এদের বিষয় হচ্ছে ঘট-বস্তু, পট-বস্তু, মঠ-বস্তু। কিন্তু প্রাচীন শব্দশাস্ত্রে শব্দের কারণ ও কার্যাবস্থা স্বীকার করা হয়। সৃষ্টবস্তুর একটা সংজ্ঞা আছে। এই সংজ্ঞা শব্দ বা নাম। কিন্তু এ শব্দ সাধারণ শব্দ। এ শব্দ ভিন্নও পরা শব্দ আছে, তা অনাদি, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই বিদ্যমান। তাকে কানে শোনা যায় না। এ হল নিঃশব্দের শব্দ (Voiceless Voice)। শব্দশাস্ত্রের আচার্যেরা একেই বস্তু বলেছেন। বিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা বাঙ্ময় বিশ্ব। নামরূপ ক্রিয়াই বাস্তব বিশ্ব। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম স্পন্দনই শব্দ বা নাদ। নাদে বিন্দুর উপৎত্তি। সাধারণ দৃষ্টিতে রূপ যেমন বস্তু থেকে পৃথক, যোগজ

দৃষ্টিতে কিন্তু বস্তু রূপ থেকে পৃথক নয়। পদার্থের সূক্ষ্মরূপের বিচার করলে দেখি, শব্দসমাবেশ ভিন্ন অর্থ বলে কোন কিছুই নেই। শব্দ-তরঙ্গ সূক্ষ্মরূপ ও সংজ্ঞা (form and name) প্রাপ্ত হয় এবং বস্তুর মত অবভাসিত হয়। বস্তুতঃ শব্দ-তরঙ্গ ভিন্ন বস্তুর কোন সত্তা নেই। শব্দ-তরঙ্গই সৃষ্টির মূল। বাকের স্থূল বিকাশ অর্থ। বাকের সূক্ষ্মরূপে শব্দই নিহিত আছে। বাক্‌ই শব্দ। বাকের সূক্ষ্ম সঞ্চার হয় রূপে, রূপের ভাবনায় ও সংজ্ঞায় প্রকাশ। প্রজ্ঞা বাক্ রূপেই প্রকাশিত হয়। এই বাক্‌কে অবলম্বন করে প্রজ্ঞালোকে আরোহণ করতে পারি।

বাক্ ও অর্থের সম্বন্ধ বলা হয়েছে। এই যে সম্বন্ধ এর সংযোগ হয়েছে সৃষ্টির আদিম অবস্থা থেকে। তাই কেউ কেউ বলেন এই সংযোগ ঈশ্বরের ইচ্ছাকৃত। ঈশ্বরের ইচ্ছাকৃত বলার চেয়ে নৈসর্গিক বলাই আরও ভাল। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেও এই সন্ধন্ধের বিচ্যুতি কখনও হয় না।

স্থূল বস্তু এখানে কিছু নেই। যা আছে তা নাম ও রূপ। তাই বাঙ্ময় জগৎই জগতের প্রকৃত-রূপ। বস্তু রূপজগতের পেছনে থাকলেও অপার্থিব—তা সৃষ্টির মূল উৎস। এই বাঙ্ময় বিশ্বে প্রবেশ করতে পারলে সাধারণ বস্তুবোধের সীমাকে অতিক্রম করি।

শব্দ বিকশিত হবার আগে প্রাণের সঞ্চার হয়। প্রাণই বিশ্বপ্রকাশের শক্তি। অব্যক্তের ব্যক্তপ্রকাশ প্রাণের কম্পনে।

প্রাণের কম্পন আকাশকে অভিঘাত করে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই জন্যেই প্রত্যেক শব্দের একটা রূপ আছে। প্রাণকম্পন ও আকাশের ব্যাপ্তির তারতম্য অনুযায়ী এই রূপের বিকাশ। কোন শব্দে প্রাণের কম্পন হয় গুরু, কোথাও বা লঘু। মন্ত্রের উৎপত্তি প্রাণের আকাশের ওপোর অভিঘাত থেকে। প্রাণের কম্পন ও অভিঘাত যত ধীর (শব্দ যত সূক্ষ্ম হবে), আকাশের ওপোর অভিঘাতও তত শান্ত। এই অভিঘাতের তারতম্যানুসারে মন্ত্রের স্বরূপ নির্ণয়। মন্ত্রের দ্বারা মহাপ্রাণে ও সূক্ষ্মাকাশে কম্পনের সঞ্চার। প্রত্যেক মন্ত্রটি এরূপ শক্তির দ্যোতক। তার ভেতর এমন শক্তি আছে যে আমাদের চেতনাকে ক্রমশঃ উর্ধ্বাভিমুখে নিয়ে যায় এবং বৃহত্তর বোধে প্রতিষ্ঠিত করে। মন্ত্রের কাজ এই। আমাদের স্বাভাবিক চেতনা থাকে বিষয়ে আকৃষ্ট ও বদ্ধ। অপরিচ্ছন্ন চেতনার স্বাভাবিক বৃত্তি অনুভব করি নে। এই অনুভব বিকাশের জন্যে শব্দ বা মন্ত্রের প্রয়োজন। চেতনার অবকাশে প্রতিষ্ঠিত হবার শব্দ একটি কৌশল মাত্র।

উপনিষদ শব্দ-ব্রহ্মবাদকে এই জন্যেই গ্রহণ করেছে। ব্রহ্ম শব্দরূপে প্রকাশ পান। শব্দ তাঁর প্রতীক। এই শব্দ প্রণব (ওঁ)। অনুভবসিদ্ধ ব্যক্তিরা বলে থাকেন এর এমন শক্তি আছে যে আমাদের চেতনাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয় থেকে মুক্ত করে মহা অবকাশের বোধে প্রতিষ্ঠিত করে। মহাকাশে সব বিশ্ব লীন হয়। থাকে মাত্র অবকাশ, নাদ

O. P. 99—৮

ও চেতনা। আমরা স্থূল আকাশ (Physical Space) থেকে মুক্ত হয়ে চেতনার অবকাশে (Spiritual Space) প্রবিষ্ট হই। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে এই অবলম্বন শ্রেষ্ঠ, এই অবলম্বন পর, এই অবলম্বনকে জেনে ব্রহ্মলোকে মহিমা প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মভূত হয়; সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

এই অবকাশের সাক্ষীই আত্মা। শব্দের একটি কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি আছে। সেই শক্তি বিক্ষিপ্ত চেতনাকে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করে। এমন কি চেতনাকে অন্তঃকরণের সংকীর্ণ সীমার গণ্ডী থেকে মুক্তি দেয় ও তার স্বাভাবিক অসীমত্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এ ভাবে শব্দ-ব্রহ্ম সাধনা ব্রহ্মনিষ্ঠা ও স্থিতির কারণ হয়। চেতনা সাধারণতঃ কাল ও দেশের ভেতর দিয়ে বিশ্ব প্রকাশ করে। এ কিন্তু দেশ ও কালের ব্যবধানের অতীত। চেতনার পূর্ণ সাড়া হলে মনে করি চেতনা অসীম, অন্তঃকরণ চেতনার উপাধি মাত্র। এই উপাধি থেকে মুক্ত হলে চেতনার স্বরূপ আপনি প্রকাশ পায়। শব্দ ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা দেয় বলেই তাকে শব্দ-ব্রহ্ম বলা হয়। অবশ্য সব শব্দের এ শক্তি নেই। যার আছে তাকেই শব্দ-ব্রহ্ম বলা হয়।

ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ

আগে যেসব বিষয়ের অবতারণা করেছি তা থেকে ব্রহ্ম-স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা হওয়া উচিত। সে ধারণাকে আরও

সুস্পষ্ট করবার চেষ্টা করবো। উপনিষদে মূর্ত ও অমূর্ত ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে।

ব্রহ্মকে জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ দ্বারা নির্ণয় করা যায় এবং তাকে সকল সম্বন্ধশূন্য স্বরূপেও জানা যায়। যখন তাঁর শুদ্ধ স্বরূপের কথা হয় তখন তিনি উপাধিশূন্য, নির্গুণ। নির্গুণ বলতে বুঝি তাঁর স্বরূপে তিনি আছেন—আর কিছু নেই। এমনকি কোন গুণ বা ধর্মও না। তিনি স্বরূপে সৎ, চিৎ এবং আনন্দ—সচ্চিদানন্দই তাঁর স্বরূপ, ধর্ম্ম নয়।

বস্তুর দুটো দিক, সত্তা আর ধর্ম। ফুলের গুণ সৌন্দর্য, সৌরভ, কোমলতা। কিন্তু এই গুণগুলিই ত ফুল নয়—তার একটা সত্তাও আছে যাতে এই গুণগুলি সন্নিবিষ্ট। সাধারণতঃ প্রত্যেক পদার্থেরই এই রকম দুটো দিক। গুণগুলি পদার্থের বৈশিষ্ট্য। সত্তারূপে একটি ফুলও যা একটি ফলও তা। ফুলের সত্তাও সত্তা, ফলের সত্তাও সত্তা। গুণই দেয় সত্তার বৈশিষ্ট্য। জলের শৈত্যগুণ জলকে অগ্নি থেকে পৃথক করে। কিন্তু সত্তারূপে তাদের কোন ভেদ নেই। জল-সত্তা সত্তা, অগ্নি-সত্তাও সত্তা।

র্মী-ধর্ম সম্বন্ধ নির্গুণে থাকে না। নির্গুণ শব্দে গুণের অভাব বুঝায়। এই ধর্মবিহীন সত্তা ব্রহ্মের আছে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন যে ব্রহ্মে সৎ, চিৎ, আনন্দ ধর্মরূপে থাকে। এ ভাবকে অবলম্বন করে তাঁরা ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপ মানেন

না। এবং তাঁরা নির্গুণ শব্দের অর্থ করেন গুণের আতিশয্য, অভাব নয়। ব্রহ্মে এত দিব্য গুণ আছে যার নির্ণয় হয় না। এমতে ব্রহ্ম সগুণ। উপনিষদ ব্রহ্ম সম্পর্কে যেখানেই গুণের কথা বলেছে, সেইখানেই সগুণ ব্রহ্মের কথা। যদি ব্রহ্মের গুণাতিশয্যই নির্গুণবোধক হয় তবে নির্গুণ কথাটি নিরর্থক। কারণ গুণাতিশয্যকে সগুণ শব্দ দ্বারাও বোঝা যেতে পারে। মানস জ্ঞানের স্বভাববশে সৎ, চিৎ, আনন্দকে পৃথকভাবে বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু পদার্থের এই ধর্মকল্পনা তার স্বরূপ কল্পনা নয়। সৎই চিৎ, চিৎই আনন্দ।

ব্রহ্মের মানস ও অতিমানস ধারণা আছে। মানস ধারণায় সৎ, চিৎ আনন্দের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়; প্রত্যেক গুণটির নিজস্ব স্ফূর্তি আছে। মানস ধারণা গুণকে তত্ত্ব হতে পৃথক করে করে দেখে—সম্পূর্ণ অভিন্নরূপে দেখে না। পূর্ণ অভিন্নরূপে দেখলে তত্ত্ব ও তত্ত্বগত গুণের কোন ভেদ থাকে না। গুণের স্ফূর্তি আছে। অনন্ত-কল্যাণ গুণাকর রূপে তিনি প্রতীত হন। কিন্তু গুণের স্ফূর্তি যেখানে নাই সেখানে সত্তার প্রকাশ। এই অখণ্ড প্রকাশে সক্রিয় গুণের কোন অবভাস হয় না বলেই ব্রহ্ম নির্গুণ। গুণের বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয় না বলেই তত্ত্ব অতিমানস। বৈশিষ্ট্য মানস প্রত্যক্ষের বিষয়, সামান্য অতিমানসের বিষয়। ব্রহ্মের সগুণ ধারণা, মানস ধারণা; নির্গুণ অতিমানস ধারণা। অতিমানস হলেও ইহা স্বরূপভূত ধারণা। গুণ সত্তাকে অধিকার করে থাকে; সত্তা গুণকে অধিকার করে থাকে না।

উপনিষদে পরম সত্তাকে আনন্দ বলে গ্রহণ করার ভেতর একটা বিরাট দৃষ্টি আছে। আনন্দকে মনে করি বিষয় বিষয়ীর সম্বন্ধ থেকে উৎপন্ন। কিন্তু এতে দৃষ্টির প্রসারতা নেই। সৃষ্টিতে আনন্দ অনুভব করি, স্থিতিতে আনন্দ অনুভব করি। আনন্দের ধারণা সাধারণতঃ এ দুই স্তরে নিবদ্ধ। কিন্তু উপনিষদে আনন্দকে বলা হয়েছে তত্ত্ব। তত্ত্বে আনন্দ না থাকলে, প্রকাশেও আনন্দ থাকে না। সৃষ্টিতে আনন্দ বহুধা প্রকাশ পায়—নামে, রূপে, ক্রিয়ায়—কিন্তু ব্রহ্মে আনন্দের কোন রূপ নেই, সঞ্চরণ নেই। প্রকাশ ও আনন্দ অভিন্ন। যেখানে প্রকাশ নেই, আনন্দও সেখানে নেই। পূর্ণ প্রকাশই আনন্দস্বরূপ। সত্তা, প্রকাশ ও আনন্দকে পৃথক করে বুঝি বলেই এদের অভিন্নভাব ধারণা করা কঠিন। কিন্তু ব্রহ্মের নিরাবরণ সত্তার ভেতর প্রকাশ ও আনন্দ অভিন্ন হয়েই থাকে। যাঁরা ব্রহ্মের এই অপ্রাকৃত স্বরূপের ভেতর গুণভেদ স্বীকার করেন, তাঁদের মতে ব্রহ্মের তিনটি গুণ (attributes)। এই স্বীকৃতির মূলে আছে মানসানুভূতি, যা আমাদের সত্তার চেতনার ও আনন্দের বৈশিষ্ট্য অনুভব করিয়ে দেয়। কিন্তু জ্ঞানের যে ভূমিকায় সত্তা আনন্দরূপে ও চেতনারূপে প্রতিভাত, তার সঙ্গে পরিচয় নেই বলেই এ কথা বলি।

ব্রহ্মশক্তি ও দেবশক্তি

ব্রহ্মই শক্তির আধার। জগতের সকলের শক্তিই ব্রহ্মশক্তি। সূর্য, চন্দ্রমা, বরুণ সকল দেবগণের শক্তিও ব্রহ্মশক্তি। প্রত্যেকের

শক্তিকে নিজস্ব কল্পনা করা যে ভুল এ বিষয়ে উপনিষদে সুন্দর একটি আখ্যায়িকা আছে। দেবাসুর সংগ্রামে দেবতারা জয়ী হয়ে এলে তাঁদের ভেতর অভিমান উপস্থিত হয়। তাঁরা মনে করেন তাঁদের শক্তির দ্বারাই সংগ্রামে জয়লাভ হয়েছে। তখন এক যক্ষ তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হল।

এ যক্ষ কে দেবগণ বুঝতে পারলেন না। তখন তাঁরা অগ্নিকে বল্লেন, "জাতবেদ! তুমিই আমাদের মধ্যে তেজস্বী, তুমি দেখত এ যক্ষ কে ?"

অগ্নি স্বীকৃত হয়ে যক্ষের কাছে গেলেন। যক্ষ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কে ?"

অগ্নি উত্তর করলেন—"আমি জাতবেদা।"

যক্ষ প্রশ্ন করলে—"কী তোমার শক্তি ?"

অগ্নি উত্তর করলেন—"পৃথিবীতে যা কিছু আছে আমার শক্তির দ্বারা দহন করতে পারি।"

তখন যক্ষ একগাছি তৃণ অগ্নির সামনে ধরে বল্লে—"এই তৃণগাছ দগ্ধ করত।"

অগ্নি যথাবিধি শক্তি প্রয়োগ করলেন, কিন্তু তৃণ দগ্ধ করতে সক্ষম হলেন না।

অগ্নি তখন দেবগণের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, "কে এ যক্ষ তা জানতে পারলেম না।"

তখন দেবগণ বায়ুকে বল্লেন "তুমি একবার যাও, দেখ ত এ যক্ষটি কে ?"

বায়ু উপস্থিত হলে যক্ষ জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কে?"

বায়ু জবাব করলেন—"আমি বায়ু।"

প্রশ্ন হল—"কী তোমার শক্তি?"

"আমি সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি।"

তখন একগাছি তৃণ রেখে যক্ষ বললে—"বেশ! এ তৃণগাছটিকে উড়িয়ে নিয়ে যাও ত দেখি।"

বায়ু তাঁর যথাযোগ্য শক্তির ব্যবহার করলেন বটে, কিন্তু তৃণগাছ বিন্দুমাত্রও স্থানচ্যুত হল না। বায়ু প্রতিহত হয়ে গিয়ে দেবতাদের বল্লেন যে তিনি যক্ষের বিষয় কিছুই জানতে পারলেন না।

তখন দেবগণ ইন্দ্রকে বল্লেন, "তুমি যাও, দেখ কে এই যক্ষ।" ইন্দ্র স্বীকৃতি জানিয়ে, সেখানে উপস্থিত হলে, যক্ষ তিরোহিত হল—ইন্দ্র তাকে দেখতেই পেলেন না। তিরোহিত হয়ে সে যক্ষ আকাশমণ্ডলে হৈমবতী বিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। এই হৈমবতীই ব্রহ্মশক্তি। ইনি 'মায়া'।

সকল শক্তির মূলে এই শক্তি। দেবতাদের আত্মশক্তির অভিমান দূর করবার জন্যে এ আখ্যায়িকাটির অবতারণা। বিশ্বশক্তিই মায়া। পাছে কারও মনে হয় তার নিজের শক্তিতে সে মহীয়ান, এইটেই সংশোধন করে দেয় উপনিষদের সুন্দর গল্পটি। উপনিষদে সর্বত্রই চেষ্টা হয়েছে ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করে বিরাটকে বরণ করার। নিজের শক্তির ওপোর অভিমান

হলে বিরাট দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়। বিরাটের সংস্পর্শচ্যুতি হলে কোন শক্তিই থাকে না। শক্তির বিরাট দৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টি আমাদের প্রভূত শক্তিসম্পন্ন করে।

জীব ও ব্রহ্ম

উপনিষদে চারিটি বাক্য আছে, যাকে মহাবাক্য বলা হয়। মহাবাক্য চরম সত্যকে প্রকাশ করে—বিশেষতঃ জীব-ব্রহ্ম সম্বন্ধ বিষয়ে। এই চারিটি বাক্য হচ্ছে, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম," "অহং ব্রহ্মাস্মি," "তত্ত্বমসি"। চারিটি বেদের চারিটি মহাবাক্য।

শ্রুতিবাক্য পর্যালোচনা করে জীব-ব্রহ্ম সম্বন্ধে মীমাংসায় উপনীত হতে হবে। সাধারণতঃ জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয় জীব অল্পজ্ঞ, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। জীব ব্যষ্টিচেতন, ঈশ্বর সমষ্টিচেতন। ঈশ্বর থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। এই বিশ্বসৃষ্টির আগে সদ্রূপেই থাকে, সেই সৎ এক ও অদ্বিতীয়। দ্বিতীয় কোন পদার্থের সৃষ্টিতে প্রয়োজন হয় না। উপনিষদে পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে যদিও জীব ঈশ্বর থেকে পৃথক তবুও আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ। মহাবাক্যগুলি এই সত্যের পরিচয়।

মহাবাক্যগুলির অর্থ পরিষ্কার হওয়া উচিত। জীব অল্পজ্ঞ, তার বেদনা আছে, ক্রিয়া শক্তি আছে, জ্ঞান আছে। এগুলি

তার অহংবোধের ভেতরই প্রকাশ হয়। আমি জ্ঞানী, আমি কর্তা। এই বোধ তার প্রকৃত স্বরূপ। এই "আমি" বোধকে অবলম্বন করে তার জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া। "আমি" কি? এই প্রকৃত প্রশ্ন। এবং এই "আমি" জ্ঞানের বিভিন্ন অবস্থায় কেমন ভাবে প্রকাশ পায় তাই হল দ্রষ্টব্য।

জীবত্ব আমাদের ওপোর আরোপিত। অবস্থাবিশেষে থাকে, অবস্থাবিশেষে থাকে না। এই আরোপিত জীবত্বকে নিয়েই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধের কথা উঠতে পারে। কারণ সম্বন্ধ ব্যক্তিতে। যেখানে ব্যক্তিত্বের লয় সেখানে সম্বন্ধের কথা ওঠে না। সেইজন্যে জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধের কথা তখনই হয়, যখন আমরা জীবের ও ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের কথা মনে করি। ব্যক্তিত্ব (personality) কথাটি দর্শনের বড় কথা। কারণ একে অবলম্বন করে আমাদের ব্যবহার। তাই জীবের সঙ্গে বিরাট ব্যক্তি ঈশ্বরের সম্বন্ধের কথা। উপনিষদে এই ব্যক্তিবোধ স্বীকৃত হয়েছে, স্বপ্নে ও জাগরণে। অতএব এই দুই অবস্থাকে নিয়ে ঈশ্বরের ও ব্যক্তিবোধের কথা আছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টিচেতনাকে নিয়েই জীব ও ঈশ্বরের ভেদ। এই দুই অবস্থাতেই ব্যষ্টি ভাবকে অবলম্বন করে জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ দেখান হয়েছে। ঈশ্বরকে কখনও অন্তর্যামী পুরুষ বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমাদের ভেতর অনুস্যূত। স্বপ্ন-জগতে সূক্ষ্ম বিশ্বে বিচরণ করি। সমষ্টি-চেতন এখানে সমষ্টি-স্বপ্নের অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ। জ্ঞানের

প্রসারতায় সমষ্টিগত চেতনার সকল শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে পরিচিত হই। এই পরিচয় প্রত্যক্ষ পরিচয়। যদিও উপনিষদে ঈশ্বরোপাসনার কথা অনেক আছে, তার কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে জীবকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। অভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠা করেই ঈশ্বরের উপাসনা করতে হয়। ভেদ বুদ্ধিকে উপনিষদ স্বীকার করেনি।

জীব ব্রহ্ম সম্বন্ধ নিয়ে পরবর্ত্তীকালে উপনিষদকে অবলম্বন করে নানাবিধ মত প্রচারিত হয়েছে। সম্বন্ধ নির্ণয় তিনটি ন্যায়ের দ্বারা করা যায়। একটি ভেদ ন্যায়, একটি ভেদাভেদ ন্যায়, একটি অভেদ ন্যায়।

ভেদ ন্যায় সকল বিষয়েই পরস্পর ভেদকে অবলম্বন করে। বিষয় বিষয়ীতে ভেদ, গুণ গুণীতে ভেদ, জ্ঞাতা জ্ঞেয়তে ভেদ, নানা ভেদের ধারণা করা হয়। এই মতে জীব ও ব্রহ্মে নিত্য ভেদ বর্ত্তমান। কখনও এই ভেদ নষ্ট হবে না। জ্ঞানের দৃষ্টিতে তাদের মতে দুটি বস্তু বিভিন্ন এবং পরস্পর পৃথকভাবেই বিরাজ করে। এই হল মধ্ব সম্প্রদায়ের মত।

ভেদাভেদ ন্যায় পদার্থের ভেতর চিরন্তন ভেদকে গ্রহণ করে না। ভেদ ও অভেদকে সমন্বয় দৃষ্টিতে দেখে। অভেদ ও ভেদ পরস্পর সংবদ্ধ। অভেদের ভেতর ভেদ থাকে। ভেদ অভেদেরই কোন বিশেষ ভাবকে বা রূপকে ব্যক্ত করে। ভেদ অভেদের সঙ্গে যুক্ত। যারা ভেদাভেদবাদী তারা জীবকে ঈশ্বর

থেকে অত্যন্ত ভিন্নও বলেন না, অভিন্নও বলেন না। তাদের মতে ঈশ্বর অঙ্গী, জীব তার অঙ্গ। ভেদাভেদবাদীর মতে জীব ও ঈশ্বর দুইই সত্য, পৃথকরূপে নয় অপৃথকরূপে। ব্রহ্ম অবয়বী, জীব অবয়ব। এই হল রামানুজ সম্প্রদায়ের মত।

তা ছাড়াও অভেদ ন্যায় আছে। এই ন্যায় ভেদাভেদের একত্র অবস্থিতি স্বীকার করে না। অভেদ ও ভেদ পরস্পর পৃথক। অভেদে কখনও ভেদ থাকতে পারে না। ভেদটা প্রতিভাস মাত্র, অভেদই সত্য। অভেদবাদীরা এক অখণ্ড সত্যের মহিমা ঘোষণা করেন। উপনিষদে জীব ও ঈশ্বরের কথা বলা হলেও পরমতত্ত্বের কথা তখনই বলা হয়েছে যখন তাদের একত্বের প্রতিপাদন করা হয়েছে। এই একত্ব চৈতন্যের একত্ব। জীবতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব একই চৈতন্যের উপাধি-ভেদ মাত্র। এই উপাধিকে বাদ দিলে এক চেতন সত্তাই থাকে। উপনিষদে জীব ও ঈশ্বরের অভিন্ন ভাবে ভাববার কথা আছে। তাদের স্বরূপকে অবলম্বন করেই অভিন্ন ভাবনা হয়। তাদের কোন শক্তিকে অবলম্বন করে নয়। ভাবনার গভীরতায় জীবের ব্যাপক বোধের অনুভূতি তার শক্তির বিকাশ হলেও, স্বরূপের প্রকাশ নয়।

তত্ত্বমসি

জীব ও ব্রহ্মের আলোচনা আগেই করেছি। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, ও অদ্বৈতবাদের দিক দিয়ে এই বাক্যের অর্থ বিভিন্ন। দ্বৈত-

বাদ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ মানে। (তত্ত্বমসিকে অতত্ত্বমসি বলে, ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম হতে ভিন্ন ও ব্রহ্মে আশ্রিত)। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ "তৎ" ও "ত্বম", ঈশ্বরও জীবের সঙ্গে একটি সম্বন্ধ স্থাপিত করেন; এই মতে জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ, "তুমি তাহার"। অদ্বৈতবাদে অর্থ, "তুমি তাই।" দার্শনিক সিদ্ধান্ত যা হোক না কেন অধ্যাত্ম জীবনে এই বাক্যের একটি গভীর অর্থ আছে। সম্বন্ধ নির্ণয় করে 'বিশেষ' ও 'অদ্বৈতের' সমন্বয় সম্ভব কিনা সেটি দর্শনের বিচার্য। অধ্যাত্ম জীবনের অনুভূতি সম্বন্ধমূলক হতে পারে, কিন্তু সম্বন্ধবোধই অধ্যাত্ম জীবনের সবটা নয়। সম্বন্ধবোধ মানস বুদ্ধি প্রসূত, অধ্যাত্ম জীবনের অনুভূতি মানস বুদ্ধির অতীত।

দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদকে দার্শনিক মীমাংসা-রূপে সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এদের একটা অধ্যাত্মানুভূতির দিক আছে। কোন দার্শনিক মীমাংসা শুধু তত্ত্বের বিশ্লেষণে পরিতৃপ্ত হয় না। সে মানব জীবনের গভীরতম অধ্যাত্ম রহস্য সম্বন্ধে কোন সুচিন্তিত ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য। নইলে জীবনের পক্ষে সে কার্যকরী হয় না। মানুষের সত্তার গভীরতা থেকে উত্থিত হয় একটা আস্পৃহা বিপুলতর জীবন ও বোধের দিকে। এই আস্পৃহাকে ভারতীয় চিন্তাধারা শ্রদ্ধা করে, কারণ জীবনের মূলে আছে এইরকম একটি অসীমের প্রেরণা। কি দ্বৈতবাদী, কি বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী, কি অদ্বৈতবাদী সকলেই বিরাট ও ভূমার অনুভবকেই

অধ্যাত্ম জীবনের পরম সম্পদ বলে মনে করেছেন। কিন্তু এই ভূমাকে আস্বাদন ও অনুভব করবার প্রণালী হচ্ছে বিভিন্ন।

দ্বৈতবাদী বিরাটকে গ্রহণ করলেও জীবাত্মাকে পরমাত্মা থেকে পৃথক করেছে সর্ব্বকালের জন্যে, এমন কি মুক্তির অবস্থাতেও। পরমাত্মা কখনও জীবাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না, যদিও জীবাত্মা পরমাত্মাকেই মুক্তিভূমিতে আস্বাদ করে। পরমাত্মার সঙ্গে জীবের ভেদ-কল্পনা করা হয়। প্রত্যেক জীবের একটা জগত আছে। তারই ভাবানুযায়ী পরমাত্মাকে গ্রহণ করে। পরমাত্মানুভূতিজনিত সুখ ও কল্যাণের আশ্রয় জীব হলেও জীবত্বের ভেদ চিরকাল থেকে যায়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এই বিরাট চেতনসত্তা ও আনন্দের অনুভূতিকে অধ্যাত্ম-জীবনের পরমবস্তু বলে গ্রহণ করেছে, এবং জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের নিকট সম্বন্ধ স্বীকার করেছে। অধ্যাত্মজীবনে জীব বিরাটকে শুধু অনুভব করে না, আস্বাদ করে আপনার প্রিয়রূপে। এই প্রিয়ভাবনাই দেয় আনন্দ ও অধ্যাত্ম জীবনের উৎকর্ষ। নানা রসে জীবনকে করে সমৃদ্ধ। সম্বন্ধবোধ দেয় জ্ঞান, প্রিয়বোধ দেয় আনন্দ। এই প্রিয়বোধেই আত্মীয়তার প্রতিষ্ঠা। আত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হলে প্রিয়ভাবের সঞ্চার। পরমাত্মার সঙ্গে আত্মভাব যত দৃঢ় হয়, প্রিয়ভাব বা রতি তত গাঢ় হয়। এই প্রীতি বা রতিই হল অধ্যাত্ম

জীবনের স্বরূপ। দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে এই মমত্ব ভাব অধ্যাত্ম জীবনের মূলে থাকলেও, ভেদ জ্ঞানকে একেবারে লোপ করে না। দ্বৈতবাদী পরমাত্মার সঙ্গে প্রিয়বোধ প্রতিষ্ঠিত করলেও জীবকে চিরকাল ভিন্ন রূপে গ্রহণ করে। জীবের স্বরূপই সেবক। কিন্তু সেব্য, সেবক ভাবের ভেতরে যে একটা একত্বের সূত্র আছে, যাকে অবলম্বন করে সেব্য, সেবক ভাবের ভেতর রস ও আনন্দ সঞ্চার হয়, সে দিকটা তাঁরা দেখেন না।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা এই প্রেমসূত্রকে অবলম্বন করে ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করেন। যিনি প্রিয়, তাঁর ভেতর আমাকেই পাই—তিনিও আমার ভেতর তাঁকেই পান। প্রিয়ের ভাবনা এই দুইকে এক করে। যেখানে দুইএর ভেতর এই একত্ব বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত না হয় সেখানে প্রিয়ের ভাবনা পরিপূর্ণ রূপ নিতে পারে না। অধ্যাত্ম-জীবন ভেদকে অতিক্রম করেই চলতে চায়, কারণ ভেদ দূরত্ব সৃষ্টি করে, অথচ অধ্যাত্ম জীবনের মূল হচ্ছে দূরত্বকে সরিয়ে দেওয়া। এই একত্ব অনুভব স্পৃহাই দিয়েছে অধ্যাত্ম জীবনের ভিত্তি, তাই পরতত্ত্বকে প্রিয় বলে গ্রহণ করলেই তার সঙ্গে সাযুজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। সাযুজ্য শুধু সম্বন্ধ নয়, তার ভেতর আছে একাত্ম ভাবের সঞ্চার। ভেদ থাকার জন্যেই প্রিয়কে পাবার আবেগ। শক্তি সঞ্চারের দ্বারা জীবে ঈশ্বরের বিরাট রূপের বিকাশও হয়। কিন্তু তাঁর সত্তার সঙ্গে পূর্ণরূপে এক হওয়া যায় না।

ঈশ্বরানুভূতি বহুরস-পূর্ণ। জীব এই রসের অনুভব করে। অথচ এইরূপ ভোগ করে অভিন্ন হয়ে। আদান প্রদান আনন্দ যজ্ঞের রীতি। এই বিশ্ব উল্লাসের স্ফূর্তিতে পূর্ণ। এই আনন্দ-যজ্ঞে আত্ম নিবেদন করে ঈশ্বরের সারূপ্য লাভ করা জীবের চরম শান্তি। এই আনন্দযজ্ঞ, বিশ্বযজ্ঞ। জীব তার ক্ষুদ্রতা, তার দেশ কালের জ্ঞানের সীমাকে অতিক্রম করে। বিশ্ববোধে ঈশ্বরের যন্ত্র হয়ে বিশ্বযজ্ঞ উদ্‌যাপন করে; বিশ্বাতীত যজ্ঞে জীব মুক্ত হয়েও হয় ঈশ্বরের সেবা ও সুখের কারণ। বিশ্ব যজ্ঞের কাল আছে। বিশ্বাতীত যজ্ঞের ও আনন্দোৎসবের কোন কাল নেই। সর্ব্বকালে সে নিত্য আনন্দে পূর্ণ। এখানে শক্তির আবেগ এত গভীর যে জীব ও ঈশ্বরের ভেদবোধ সর্বদা প্রকাশ পায় না। প্রেমের ও শক্তির আবেগে এই ভাব হয় ক্ষণিক। এটি স্থায়ী নয়। কারণ তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নভাব তাঁরা স্বীকার করেন না। এবং তত্ত্বতঃ অভিন্ন হলে প্রেমের কোন ক্রিয়া থাকে না। জ্ঞানের দৃষ্টিতে একটি বিরাট সমন্বয়ের বোধ এই অবস্থায় স্ফূর্ত হয়।

এখানেই অদ্বৈতবাদের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ থেকে তফাৎ। অদ্বৈতবাদী বলেন, প্রেমের উপজীব্য আনন্দ—আনন্দই রস। আত্মা আনন্দস্বরূপ। প্রেমের স্বাভাবিক গতি আত্মার দিকে। এই আত্মবোধের স্ফুরণ সকলের ভেতর, তাই তারা প্রিয়। আত্মবোধ বা স্পর্শ যেখানে নেই, সেখানে প্রিয়ভাবও নেই। আত্মার প্রিয়ত্ব অদ্বৈতবাদে যেরূপ স্বীকৃত হয়েছে,

অন্য বাদে সে রকম হয়নি। অন্যত্র পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে গণ্য করা হয়েছে, অদ্বৈতবাদেও পরমাত্মাকে প্রিয় বলা হয়েছে। পরমাত্মা আত্মা থেকে অভিন্ন এবং আত্মারই স্বরূপ। অদ্বৈতবাদে আত্মা পরমাত্মার অভিন্ন অবস্থাই আনন্দের স্বরূপ অবস্থা, নিরুপাধিক অবস্থা। নিরুপাধিক আনন্দে প্রীতি স্বাভাবিক, তা সত্যিকার প্রীতিরই রূপ।

এই সব অবস্থা ভিন্ন "তত্ত্বমসি" বাক্যের আর একটা অর্থ করা হয়। এখানে সত্তার অভিন্নতা অপেক্ষা শক্তির অভিন্নতাকে গ্রহণ করা হয়। পরমাত্মার ইচ্ছায় জীবের ইচ্ছাকে মিলিয়ে শক্তিপূর্ণ হওয়াই এর লক্ষ্য। একে শক্ত্যদ্বৈত বলা যায়। একেই অহংগ্রহ উপাসনা বলে। এতে জীবকেই পুষ্ট করা হয়, ঈশ্বরের শক্তি ও ইচ্ছাকে আকর্ষণ করে। এখানে জীবের ব্যক্তিত্ব বা ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের লয় করা হয় না। কিন্তু জীবের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে হয় অভিন্ন—ফলে জীব নানা শক্তিতে বিভূষিত হয়। অহংগ্রহোপাসনা দেয় শক্তি, ঈশ্বরের শক্তির সঙ্গে একত্ব। প্রেম দেয় আনন্দের সঙ্গে একত্ব, জ্ঞান দেয় সত্তার ও চিতের সঙ্গে একত্ব। জ্ঞান, ইচ্ছা প্রেমের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে ব্রহ্মানুভূতির দিকে। ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে একত্ব লাভ করতে পারলেই তার কৃতার্থতা। ব্রহ্মানন্দ লাভ করে প্রেম পুষ্ট। জ্ঞান সত্তার অপরিচ্ছন্নত্বের অনুভূতিতে পূর্ণ। এ সব অনুভূতির তারতম্য থাকে। নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মসত্তা ক্রিয়াশীল হয় না, তাই সে ভূমিতে ইচ্ছার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রেমের কোন বিকাশ এখানে

নেই—যদিও থাকে, তা নিরূপাধিকের। ইচ্ছা ও প্রেম,—এদের বিকাশ হয় সগুণ ভূমিতে। এই বিভিন্ন প্রকারের অভিন্নত্ব "তত্ত্বমসি" বাক্যে নিহিত আছে। কিন্তু জীব ও ঈশ্বরের পূর্ণ অভিন্নত্ব সগুণে সম্ভব হয় না। এ জন্যে এ বাক্যকে নির্গুণের দ্যোতক রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের সত্তার ভেতরে পূর্ণপ্রকাশ উপলব্ধি করবার জন্যে একটি অন্তর্নিহিত প্রেরণা আছে। ঈশ্বর ও ব্রহ্ম-ভূমিকা লাভ হয় এই প্রেরণা থেকে ; এই প্রেরণায় সত্তা পূর্ণভাবে জাগ্রত হয়। কিন্তু তার জাগরণের শেষ-ভূমিকা অদ্বৈত জ্ঞান। কারণ জীবের আবরণ সেইখানেই উন্মোচিত। অপ্রতিহত ইচ্ছা, প্রেমস্ফূর্তি, বিশ্ববিজ্ঞান—এরা সকলেই আমাদের সীমাবদ্ধ জীবনের সংবেগ থেকে মুক্তি দেয়, কিন্তু তখনও থেকে যায় জীবত্বের সীমা। জীবত্ব যতই পুষ্ট হোক না কেন, তার লাঘবতা দূরীভূত হয় না, যদি সে তার নিরুপাধিক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না হয়। জীবন-কল্লোল সেখানে অপসারিত, মেঘমুক্ত আকাশের মত, বন্ধনমুক্ত আত্মা তখন বিরাজ করে নিজের মহিমায়। এটা শূন্য নয়, পূর্ণ নয়—শূন্য ও পূর্ণের অতীত—শান্তং শিবং অদ্বৈতং।

আত্মা ও জ্ঞানের ভূমিকা

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিষয় গভীর ও নিগূঢ়। তত্ত্ববিদ্যাও অনুশীলনের জন্যে তা বোঝা দরকার।

O. P. 99—১০

জ্ঞানের চারিটি ভূমিকা আছে। আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়—এই চারটি ভূমিকার সুস্পষ্ট বিবরণ জানা দরকার। জ্ঞানই আত্মা। কিন্তু এই সত্য ও সিদ্ধান্তকে বুঝতে হলে জ্ঞানের যেসব স্তর আছে তার বিশ্লেষণ আবশ্যক। সামান্যরূপে জ্ঞান আমাদের সব অবস্থায় থাকে। জাগ্রত-জ্ঞানও জ্ঞান, স্বপ্ন-জ্ঞানও জ্ঞান, কিন্তু এদের ভেতর জ্ঞানের সামান্য ভাব থাকলেও কেউ স্বরূপ নয়।

বিজ্ঞেরা মানুষের অন্তঃসত্তার ভেতর স্বতঃসিদ্ধ বস্তু অনুভব করে থাকেন। সেই হচ্ছে "আমি-বোধ" (Self-consciousness) এই "আমি-বোধ" আমার জ্ঞানের মূল ভিত্তি। আমার জ্ঞানের ভেতর দিয়ে এই "আমি"র স্বতঃসিদ্ধ· স্ফুর্তি। এটি অনুভবসিদ্ধ, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। এই "আমি" জ্ঞানের কেন্দ্র। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত জ্ঞান এই "আমি"তেই লাভ করছে তাদের শৃঙ্খলা। সংশয়েও স্ফুর্ত হয় এই বোধ। জ্ঞানের অন্তঃকেন্দ্র "আমি" হলেও, আমাদের বোধ শুদ্ধ "আমি"র (কেবল জ্ঞান-স্বরূপ আমির) সব সময় বিকাশ হয় না। জ্ঞানের অবস্থান্তর আছে। এই অবস্থাগুলির পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারবো যে সর্ব্বত্র জ্ঞানে এই "আমি-বোধ" অনুস্যূত হলেও, এর স্বরূপ সর্বত্র প্রকাশ হয় না।

জ্ঞান বিষয় প্রকাশ করলেও শুধু বিষয় প্রকাশ করাই তার স্বরূপ নয়। আলোকের স্বভাব অন্ধকার নাশ করা। কিন্তু আলোকের স্বরূপ তাই নয়। আলোকের স্বরূপ দীপ্তি,

জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ। আলোকের কাছে যেমন কিছু থাকলে তা আপনই প্রদীপ্ত হয় তেমনি জ্ঞানের কাছে বিষয় থাকলে স্বতঃই তার প্রকাশ হয়। কিন্তু এই জন্যে বিষয় প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বরূপ একথা বলা চলে না। বিষয় আর জ্ঞানের সম্বন্ধ নিত্য নয়। জ্ঞান বিষয়কে অপেক্ষা না করেই থাকে। সে স্বতঃস্ফূর্ত। এই স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের অনুভূতি দেয় আত্মস্বারাজ্য। এ জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় বড় হয় না। চিত্ত বিষয়ের প্রতি ধাবিত, বিষয়কে অতিক্রম করে জ্ঞানের স্বরূপের দিকে অবহিত নয়।

যাজ্ঞবল্ক্যের কথার সার মর্ম এই যে জ্ঞানের নিজের একটা রূপ আছে যা স্বয়ংজ্যোতি, যা স্বপ্রকাশ। সাধারণতঃ আমরা বিষয়প্রকাশরূপী জ্ঞানকে অনুভব করি। তার স্বরূপকে জানি না।

জাগ্রত অবস্থায় জ্ঞানের কী রূপ? জাগ্রত ভূমিতে দেখি, শুনি, আঘ্রাণ করি; জ্ঞান এখানে ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে বিষয়ের সংবেদন দেয়। এতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের জ্ঞান হয়। রূপের জ্ঞান কিন্তু রূপ নয়, শব্দের জ্ঞানও শব্দ নয়। জ্ঞান বিষয় হতে ভিন্ন, যদিও এতে আছে বিষয়ের প্রকাশ। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ভিন্ন জাগ্রত ভূমিতে বিষয়ের কিছু জানি না; কতকগুলি স্পন্দনই চেতনার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু জ্ঞানে এই স্পন্দন ভিন্ন আর কোন পদার্থ অনুভূত হয়

না। স্পন্দনের কারণ থাকতে পারে কিন্তু আমাদের জ্ঞানে সেই কারণের পরিচয় পাই না। আমাদের অন্তর্বেদনাই সৃষ্টি করে জ্ঞানের জগৎ। প্রত্যেক জ্ঞাতার এক একটা জগৎ আছে। জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞান বিভিন্ন। জ্ঞান যখন কেন্দ্রীয়ভূত হয়ে ক্রিয়াশীল হয়, তখনই জ্ঞাতৃত্বের অনুভূতি জাগে। আমাদের জগৎ এই কেন্দ্রকে নিয়েই সৃষ্ট। জাগ্রত জ্ঞানের দুটী অবস্থা দেখতে পাই—কখন তাতে স্পন্দন থাকে, কখন থাকে না। স্পন্দনই জ্ঞানের ক্রিয়া। এই ক্রিয়া বিষয় প্রকাশ করে। কিন্তু জ্ঞানের এই ক্রিয়া অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করেই। অন্তঃকরণ সংযোগ হলেই জ্ঞান হয় জ্ঞাতা। আগেই বলেছি জ্ঞানের স্বরূপে এই জ্ঞাতৃত্ব নেই।

জাগ্রত অবস্থায় জ্ঞান জ্ঞাতারূপেই প্রতিভাত, কেননা তখন অন্তঃকরণযুক্ত হয়ে বিষয়কে দেখি, স্পর্শ করি, শ্রবণ করি। একথা সত্যি হ'লেও জ্ঞানের উন্মুক্ত স্বরূপের কখনও বিনাশ হয় না। জ্ঞাতারূপেও জ্ঞান উন্মুক্ত যদিও এর প্রকাশ সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়। জ্ঞানের কোন পরিধি নেই, কোন বিশেষ কেন্দ্র নেই। কিন্তু জ্ঞাতার পরিধি আছে, কেন্দ্র আছে।

জাগ্রত ভূমিতে এই পরিধিবিহীন জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় না হলেও, কখনও কখনও জ্ঞানের সাক্ষীরূপের পরিচয় পাই। সাক্ষী দেখে মাত্র, বিষয় গ্রহণ করে না। বস্তুতঃ সে শুধু দৃশি। সাক্ষী স্পন্দনহীন জ্ঞান।

জাগ্রত অবস্থায় একের জগৎ অন্যের জগৎ থেকে ভিন্ন। কিন্তু এই বিভিন্ন জগৎ একটি জগতেরই অনুসন্ধান দেয়—ব্যবহারের বিষয় একটা সাধারণ জগৎ। একটি ফুলের সংবেদনা দু'জনের বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু একটি বিষয়কে নিয়েই তাদের সংবেদনা। বিষয় বহু নয়, যদিও সংবেদনা বহু। সংবেদনাকে অতিক্রম করে একটি জগৎ আছে। কিন্তু এরকম জগৎ থাকলেও তার প্রকাশ জ্ঞানে। পদার্থ আছে অথচ তার জ্ঞান নেই—এ অসম্ভব। জ্ঞানই অস্তিত্বের সাক্ষী। সমগ্র বিষয়ের বোধ এইজন্যে এক সমগ্র জ্ঞানের ভেতরই স্ফূর্ত। এই সমষ্টি-জ্ঞানে বিশ্ব বিধৃত। ব্যষ্টিও সমষ্টি-জগৎ নিয়েই বিশ্ব। সমষ্টি-জগৎ বিরাট চেতনায় স্থিত, ব্যষ্টি-জগৎ খণ্ডচেতনায় প্রতিভাত। এই ব্যষ্টি ও সমষ্টি ও সমষ্টি-জগতের একটী সূক্ষ্মরূপ আছে, যা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নয়। সেটা প্রকাশিত হয় স্বপ্নলোকে। স্বপ্নলোকে সংবেদনা আছে, কিন্তু সে সংবেদনা সংস্কারের, বিষয়ের নয়। তখন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অন্তঃকরণের কোন যোগ থাকে না। এই সংস্কার নানাবিধ ; মনের নানা স্তর থেকে তার উৎপত্তি। তাই স্বপ্ন জগতের তত্ত্বনির্ণয়ে মনোবিদ্‌দের মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য। অন্তঃকরণের প্রসারিত সত্তার পূর্ণরূপের পরিচয় না থাকায় স্বপ্নজগতের সম্যক ধারণা পাই না।

উপনিষদে স্বপ্নজগৎ সম্বন্ধে ধারণা এই—স্বপ্ন সংস্কারের সৃষ্টি। এই সংস্কার অন্তঃকরণেই। নিদ্রাভিভূত হলে বিষয় থেকে অন্তঃকরণ বিচ্ছিন্ন হয়, তখন ইন্দ্রিয় ক্রিয়া

করে না। এই অবস্থায় অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম সংস্কারগুলি স্বপ্নরূপে প্রকাশিত হয়। স্বপ্ন জগৎও জগৎ। এই জগতের দ্রষ্টা ও ভোক্তা আত্মা। স্বপ্নের সৃষ্টি বলে এর কোন খর্বতা নেই। অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে বিষয়-অভিমুখী হয় বলেই আমরা জাগ্রতকে স্বপ্নের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দিই। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কিন্তু স্বপ্ন বলেই স্বপ্নসৃষ্টি মিথ্যে নয়। বরং সৃষ্টির মায়াময় রূপ স্বপ্নেই বুঝি।

স্বপ্নের দুটি অবস্থা। এক রকম স্বপ্নে আমরা স্বপ্নজগৎকে ভোগ করি—যা কিছু শুনি, যা কিছু দেখি, তা থেকে আনন্দ লাভ করি। এরূপ স্বপ্নে বিষয়ই প্রাধান্য লাভ করে। আত্মা এই বিষয়কে ভোগ করে। আর এক রকম স্বপ্নে আত্মা জগতকে দেখে, কিন্তু ভোগ করে না। কোন সুখ-দুঃখে আত্মা লিপ্ত হয় না। অবিশ্রান্ত ধারায় স্বপ্নজগতের সৃষ্টির প্রবাহ বয়ে যায়; আত্মা উদাসীনরূপে তা দেখে। সৃষ্টির দুটী রূপ—একটী বাস্তব রূপ, আর একটী মায়িক রূপ। বাস্তব রূপে এই বিশ্বদৃশ্য প্রকৃত সত্য এবং ঈশ্বর এর সৃষ্টি করেন। মায়িক সৃষ্টি স্বপ্নসৃষ্টি। তার প্রকাশ আছে, উপস্থিতি আছে, কিন্তু বাস্তবতা নেই। মায়িক রূপে এই দৃশ্য থাকলেও তা সত্য নয়। তার উপাদান মায়া, রূপও মায়া। মায়িক, কেন না একে দেখি, স্পর্শ করি, অনুভব করি; তবু এর কোন বাস্তব রূপ নেই। এই আছে অথচ নেই। বাস্তব সৃষ্টি চিরকালই আছে, চিরকালই থাকবে। মায়িক সৃষ্টি কখনও হয়নি, থাকবেও না, অথচ

একে আমরা দেখি। এর মায়িকত্ব এখানেই—সে জ্ঞানের বিষয় হয়েও সত্য হয় না।

মায়িক সৃষ্টির আর এর বিশেষত্ব আছে। সেটা হচ্ছে কোন বাস্তব উপাদানকে গ্রহণ না করেই সৃষ্ট হওয়া। বাস্তব উপাদানকে গ্রহণ করলেই সৃষ্টি নিত্য সত্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সৃষ্টি যেখানে শক্তির কেন্দ্রচ্যুতি, সেখানে বাস্তব উপাদান নেই। এ সৃষ্টি একটা বিকাশ মাত্র, সে বিকাশের মূলে কোন উপকরণ নেই। স্বপ্নবিকাশের মত এ অবাস্তব। উপনিষদে এইজন্যে ঈশ্বরকে "মায়ী" বলা হয়েছে। ব্যষ্টি-স্বপ্ন ব্যষ্টি-সংস্কারের পরিণতি। সমষ্টি-স্বপ্ন সমষ্টিগত সংস্কারের পরিণতি।

মুক্তির প্রাথমিক চেষ্টাতে বিশ্বদৃশ্য স্বপ্ন মিথ্যা এই জ্ঞান আবশ্যক। এই জ্ঞানই আমাদের মুক্তির সন্ধান দিয়ে দেয়। এই জ্ঞানে প্রাণের চাঞ্চল্য রহিত হয়ে আসে। জীবের জীবত্বের সঙ্কীর্ণতা অপগত হয়। বিশ্বদৃশ্য স্বপ্ন নাগরী তুল্য মায়াময় রূপে প্রতিভাত হয়।

আত্মা এই স্বপ্ন জীবনের নিমিত্ত উপাদান কারণ। আত্মা, নিজের বিশ্বের সৃষ্টি নিজেই করেন। এই সৃষ্টি প্রতিভাসিক। সৃষ্টির এইরূপ দৃষ্টি, ইষ্ট অনিষ্ট বোধ বিগলিত করে দেয় এবং মানুষের অনেক আকর্ষণ হ'তে মুক্তি হয়। প্রাণস্তর নিথর শান্ত হ'য়ে আসে এবং আত্মার সাক্ষীভূত হয়ে এই বিশ্ব দৃশ্য

দেখে। ব্যবহারের ভূমিকায়, আত্মা উদাসীন সাক্ষীরূপে এই ক্ষেত্রে বিরাজ করেন। এইরূপ বোধ মুক্তির ভূমিকার অব্যবহিত পূর্ব্বস্তর। এখানে সাধকের কর্ত্তৃ ভাবের অবসান এবং আত্মভাবের উদ্গম। স্বপ্ন প্রাণের জগতের চাঞ্চল্য হ'তে মুক্ত করে। পুনঃপুনঃ প্রাণ প্রবেশে আত্মা বিষয় রস আস্বাদন করে। এই প্রাণের সংকোচ বৃত্তি হ'তে মুক্তি দেয় স্বপ্ন। স্বপ্নে প্রতিভাসিক ভোগ থাকলেও, সে ভোগে বন্ধন হয় না। কারণ সে ভোগে প্রাণবৃত্তির চাঞ্চল্য হয় না। যেখানে ভোগের সহিত প্রাণের বৃত্তিচঞ্চল হয়, সেখানে বুঝতে হবে বন্ধনরজ্জু শিথিল হয় নাই। এরূপ স্বপ্নের সৃষ্টিকে সান্ধ্য সৃষ্টি বলা যেতে পারে। জাগ্রতের অবসানে সংস্কার সৃষ্টি। অব্যবহিত পূর্ব্বে এরূপ অর্দ্ধ জাগ্রত অর্দ্ধ সুপ্ত স্বপ্নাবস্থা পরিপূর্ণ মিথ্যারূপ নিয়ে প্রতিভাত হয় না। জাগ্রতের স্থূল সংস্কার ক্রিয়াশীল হয় ব'লেই শুদ্ধ স্বপ্নের ন্যায় ইহা বিজ্ঞান সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হয় না। আরোহ ক্রমে চিত্তের এই একটা অবস্থা বিশেষ। মুক্তির ভূমিকার দিকে অগ্রসর হলে বাস্তববিশ্ব নামরূপে পরিণত হয়। সৃষ্টির বাস্তবতা বিগলিত হয়, এবং এরূপ সংস্কার হতে মুক্তি হয়। এই জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থা ব্যতিরেকে আর একটা অবস্থা আছে। তার নাম 'সুষুপ্তি'। সুষুপ্তিতে সংস্কারের কোন ক্রিয়া থাকে না। সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণও শান্ত হয়, কেবল প্রাণের ক্রিয়া থাকে। জাগ্রতে বা স্বপ্নে বিষয় আছে। সুষুপ্তির কোন বিষয় নেই। বিশেষ জ্ঞানের কোন সঞ্চয় থাকে না। বিষয়ের অভাবই তার বিষয়। বিষয় হতে নির্মুক্ত বলে বোধ এখানে প্রশান্ত, উদার, কিন্তু

অজ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত নয়। এ জ্ঞানের স্বরূপ "আমি কিছু জানিনে"।

পরবর্ত্তী আচার্যদের মতে সুষুপ্তিতে তিনটী বৃত্তি থাকেঃ অবিদ্যা বৃত্তি, সাক্ষীবৃত্তি ও আনন্দবৃত্তি। আমি কিছু জানি না, বেশ ঘুমুচ্ছিলেম—এখানে সমস্ত বিষয়ের অবসান ও অভাব হ'লো বিষয়। একটা নির্ব্বিশেষ অবিদ্যা প্রকাশ। এ ছাড়া সাক্ষীর ভান থাকে এবং বিষয়রাহিত্য আনন্দের ভান। বিষয় থাকে না, এজন্য চিত্ত ক্রিয়াশীল হয় না এবং চিত্তের প্রতিফলিত সত্ত্বা অখণ্ডরূপে স্ফুর্ত্তি পায়। যদিও এ স্ফুর্ত্তি সম্যক স্ফুর্ত্তি নয়। সম্যক স্ফুর্ত্তির ভানে আনন্দের উদ্‌গম।

মাণ্ডুক্য-উপনিষদে জাগ্রৎ চেতনাকে "স্থূলভূক্", স্বপ্ন-চেতনাকে "প্রবিবিক্তভূক্", সুষুপ্তিচেতনাকে "আনন্দভূক্" বলা হয়েছে। একটি স্থূল বিশ্বের জ্ঞান, অপরটি সূক্ষ্ম বিশ্বের, অন্যটি কারণ বিশ্বের জ্ঞান। একটির উপাদান স্থূল বস্তু, অপরটির সংস্কার, অন্যটির অবিদ্যা। এ বিশ্বগুলি সমষ্টিরূপে গৃহীত হয়েছে। জাগ্রতে সমষ্টি স্থূলবিশ্ব, এক সমষ্টি-চেতনায় উদ্ভাসিত।

চেতনা এখানে সমষ্টি স্থূল জগতে অনুস্যূত হয়ে স্থূল বিশ্বের প্রকাশ করে। তেমনি সূক্ষ্মবিশ্বে সমষ্টি সংস্কারের জ্ঞান সমষ্টি সূক্ষ্ম-চেতনায়। সুষুপ্ত বিশ্বের জ্ঞান সমষ্টিগত কারণ চেতনায়। জ্ঞানের সর্বত্রই বিষয় আছে, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ; যদিও

দেখে। ব্যবহারের ভূমিকায়, আত্মা উদাসীন সাক্ষীরূপে এই ক্ষেত্রে বিরাজ করেন। এইরূপ বোধ মুক্তির ভূমিকার অব্যবহিত পূর্ব্বস্তর। এখানে সাধকের কর্ত্তৃ ভাবের অবসান এবং আত্মভাবের উদ্গম। স্বপ্ন প্রাণের জগতের চাঞ্চল্য হ'তে মুক্ত করে। পুনঃপুনঃ প্রাণ প্রবেশে আত্মা বিষয় রস আস্বাদন করে। এই প্রাণের সংকোচ বৃত্তি হ'তে মুক্তি দেয় স্বপ্ন। স্বপ্নে প্রতিভাসিক ভোগ থাকলেও, সে ভোগে বন্ধন হয় না। কারণ সে ভোগে প্রাণবৃত্তির চাঞ্চল্য হয় না। যেখানে ভোগের সহিত প্রাণের বৃত্তিচঞ্চল হয়, সেখানে বুঝতে হবে বন্ধনরজ্জু শিথিল হয় নাই। এরূপ স্বপ্নের সৃষ্টিকে সান্ধ্য সৃষ্টি বলা যেতে পারে। জাগ্রতের অবসানে সংস্কার সৃষ্টি। অব্যবহিত পূর্ব্বে এরূপ অর্দ্ধ জাগ্রত অর্দ্ধ সুপ্ত স্বপ্নাবস্থা পরিপূর্ণ মিথ্যারূপ নিয়ে প্রতিভাত হয় না। জাগ্রতের স্থূল সংস্কার ক্রিয়াশীল হয় ব'লেই শুদ্ধ স্বপ্নের ন্যায় ইহা বিজ্ঞান সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হয় না। আরোহ ক্রমে চিত্তের এই একটা অবস্থা বিশেষ। মুক্তির ভূমিকার দিকে অগ্রসর হলে বাস্তববিশ্ব নামরূপে পরিণত হয়। সৃষ্টির বাস্তবতা বিগলিত হয়, এবং এরূপ সংস্কার হতে মুক্তি হয়। এই জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থা ব্যতিরেকে আর একটা অবস্থা আছে। তার নাম 'সুষুপ্তি'। সুষুপ্তিতে সংস্কারের কোন ক্রিয়া থাকে না। সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণও শান্ত হয়, কেবল প্রাণের ক্রিয়া থাকে। জাগ্রতে বা স্বপ্নে বিষয় আছে। সুষুপ্তির কোন বিষয় নেই। বিশেষ জ্ঞানের কোন সঞ্চয় থাকে না। বিষয়ের অভাবই তার বিষয়। বিষয় হতে নির্মুক্ত বলে বোধ এখানে প্রশান্ত, উদার, কিন্তু

অজ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত নয়। এ জ্ঞানের স্বরূপ "আমি কিছু জানিনে"।

পরবর্ত্তী আচার্যদের মতে সুষুপ্তিতে তিনটী বৃত্তি থাকে: অবিদ্যা বৃত্তি, সাক্ষীবৃত্তি ও আনন্দবৃত্তি। আমি কিছু জানি না, বেশ ঘুমুচ্ছিলেম—এখানে সমস্ত বিষয়ের অবসান ও অভাব হ'লো বিষয়। একটা নির্ব্বিশেষ অবিদ্যা প্রকাশ। এ ছাড়া সাক্ষীর ভান থাকে এবং বিষয়রাহিত্য আনন্দের ভান। বিষয় থাকে না, এজন্য চিত্ত ক্রিয়াশীল হয় না এবং চিত্তের প্রতিফলিত সত্ত্বা অখণ্ডরূপে স্ফুর্ত্তি পায়। যদিও এ স্ফুর্ত্তি সম্যক স্ফুর্ত্তি নয়। সম্যক স্ফুর্ত্তির ভানে আনন্দের উদ্‌গম।

মাণ্ডুক্য-উপনিষদে জাগ্রৎ চেতনাকে "স্থূলভূক্", স্বপ্ন-চেতনাকে "প্রবিবিক্তভূক্", সুষুপ্তিচেতনাকে "আনন্দভূক্" বলা হয়েছে। একটি স্থূল বিশ্বের জ্ঞান, অপরটি সূক্ষ্ম বিশ্বের, অন্যটি কারণ বিশ্বের জ্ঞান। একটির উপাদান স্থূল বস্তু, অপরটির সংস্কার, অন্যটির অবিদ্যা। এ বিশ্বগুলি সমষ্টিরূপে গৃহীত হয়েছে। জাগ্রতে সমষ্টি স্থূলবিশ্ব, এক সমষ্টি-চেতনায় উদ্ভাসিত।

চেতনা এখানে সমষ্টি স্থূল জগতে অনুস্যূত হয়ে স্থূল বিশ্বের প্রকাশ করে। তেমনি সূক্ষ্মবিশ্বে সমষ্টি সংস্কারের জ্ঞান সমষ্টি সূক্ষ্ম-চেতনায়। সুষুপ্ত বিশ্বের জ্ঞান সমষ্টিগত কারণ চেতনায়। জ্ঞানের সর্বত্রই বিষয় আছে, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ; যদিও

সুষুপ্তিতে জ্ঞানের কোনও বিশিষ্ট বিষয় নেই, নির্ব্বিশেষ অবিদ্যাই বিষয়।

অবিদ্যার (মায়া বা শক্তির) সবিশেষ, নির্বিশেষ রূপ আছে। সবিশেষ রূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম বিশ্বে মূর্ত। নির্বিশেষ রূপ কারণ রূপ। সক্রিয় হলেও কোনও মূর্ত (concrete) রূপ নেই। কার্য বিশ্বে সৃষ্টিতে অবিদ্যা মূর্ত্তরূপে প্রকাশ পায়। কারণ বিশ্ব নির্বিশেষ উপাধি নিয়ে থাকে। এ ভূমিকায় চেতনাকে আনন্দভূক্ বলা হয়েছে; সকল বিষয়ের পরিচ্ছিন্নতা হতে মুক্ত বলেই একটি আনন্দের অবভাস হয়। বিষয়াকারা বৃত্তি হতে মুক্ত বলেই একটি অমূর্ত আনন্দের সংবেদনা এখানে আছে। কিন্তু অবিদ্যার সম্পূর্ণ তিরোধান নেই বলে এ ভূমিকাতে পূর্ণজ্ঞান বা আনন্দের বিকাশ নেই।

সুষুপ্তি ছাড়াও আর একটি অবস্থা আছে—তুরীয়। এ ভূমিতেও জ্ঞানের কোন বিষয় নেই। শুধু জ্ঞানই আছে। এ নির্বিষয় জ্ঞানই চরমানুসন্ধান। এ একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অবস্থা। বিষয়-বিষয়ী বোধ হতে এ মুক্ত। এ অবস্থায় মানুষ হয় অশোক ও অভয়। মানুষ তৃপ্ত, শান্ত ও সমাহিত হয়। এ দেয় জীবত্বের সীমা-সংকীর্ণতা থেকে চিরমুক্তি। সুষুপ্তিতে বিষয়ের জ্ঞান নেই, তুরীয়তেও নেই। সুষুপ্তিতে বিষয়ের অভাবের জ্ঞান আছে, কিন্তু তুরীয়তে তাও নেই। তুরীয়ের এখানেই সুষুপ্তির থেকে পার্থক্য। আচার্যেরা বলেন, সুষুপ্তিতে অবিদ্যার বৃত্তি আছে, তুরীয়তে কোন

বৃত্তিই নেই। দুইই অবশ্য বিষয়-বিষয়ীর জ্ঞান হতে মুক্ত, কিন্তু এখানেই তাদের তফাৎ। বেদান্তের ভাষায় বলতে গেলে কথাটা দাঁড়ায় এই যে—স্বপ্ন ও জাগ্রত-ভূমিতে অবিদ্যার বিশেষ আকারে ভাণ হয়, সুষুপ্তিতে তার কোন আকার থাকে না। তুরীয়তে অবিদ্যার, কি সবিশেষ কি নির্বিশেষ, কোন ভাবই থাকে না। থাকে আত্মজ্যোতি। ছান্দোগ্যোপনিষদে ইন্দ্রবিরোচন সংবাদে এর আলোচনা হয়েছে।

আত্মাই আলো

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আত্মজ্যোতি সম্বন্ধে এই উপাখ্যানটি দেখতে পাই।

জনক—জীব কোন্ আলোর সাহায্যে কাজ করে ?
যাজ্ঞবল্ক্য—সূর্যের আলোতেই সব কাজ নিষ্পন্ন করে।
জনক—আকাশে সূর্যের আলো যখন না থাকে ?
যাজ্ঞবল্ক্য—তখন চন্দ্রালোকের সাহায্য নেয়।
জনক—আর যখন চন্দ্রের আলোও পাইনে ?
যাজ্ঞবল্ক্য—অগ্নির আলোকে তখন বিশ্ব আলোকিত।
জনক—আর যখন অগ্নিও থাকে না ?
যাজ্ঞবল্ক্য—আত্মজ্যোতিতে বিশ্ব তখন প্রকাশিত।

যাজ্ঞবল্ক্য এর দ্বারা বুঝালেন আত্মজ্ঞানই সব জ্ঞানের আধার, সকল ভূমিকাতে এই আত্মজ্ঞান প্রতিফলিত হয় বলেই অবস্থা-বিশেষের জ্ঞান পাই। সকল জ্ঞানই আত্মাকে অপেক্ষা করে হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান কাউকেই অপেক্ষা করে না—স্বয়ংজ্যোতি সে।

আত্মার রূপ

উপনিষদের আলোচনায় জীবাত্মা ও পরমাত্মায় তফাৎ নেই। আত্মার স্বরূপ হচ্ছে, উপনিষদের ভাষায়, সাক্ষী, চেতা, কেবল ও নির্গুণ। আত্মার চেতন স্বরূপ আগেই লক্ষ্য করেছি, তার নির্গুণ স্বরূপকে নিয়েও আলোচনা করেছি। তিনি 'কেবল', কারণ তাঁর সত্তাই একমাত্র সত্তা; তিনি সাক্ষী।

আত্মার সাক্ষীরূপকে ভাল করে বুঝতে হবে, এর ওপরেই উপনিষদ বিদ্যার সাধনা ও সিদ্ধি দুইই নির্ভর করে। সাক্ষী উদাসীন দ্রষ্টা, তার ক্রিয়া নেই, জ্ঞান আছে। সব জ্ঞানেরই সাক্ষী আছে, সাক্ষী জ্ঞানের রূপ। জাগ্রতে সাক্ষী আছে, স্বপ্নে সাক্ষী আছে, সুষুপ্তিতে সাক্ষী আছে। প্রত্যেক জ্ঞানের দুটি রূপ: একটি বিষয়-প্রকাশ ও বিষয়-ভোগ করার ধর্ম, আর একটি বিষয়ের প্রতি উদাসীনতা। যে জ্ঞান বিষয়ভোগ করে সে সাক্ষী নয়, যে সব ভোগ দেখে অথচ ভোগ করে না সেই সাক্ষী। (অবশ্য দেখা ক্রিয়াও এখানে নেই, তবু উপযুক্ত ভাষার অভাবে "দেখা" কথাটি ব্যবহার করতে বাধ্য হই।) বিষয়ের সঙ্গে তার কোনও সংস্পর্শ হয় না বলেই সাক্ষী-চেতনার রূপ সব অবস্থাতেই এক—শুদ্ধ জ্ঞান ও অবভাস।

উপনিষদে এই সাক্ষীর কথা খুব অল্প বলা হলেও তার স্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ, এ কথার যথেষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পাই। এই সাক্ষী-চেতনা অধিগম হলেই উপনিষদ-বিদ্যা লাভ করবার পথ সহজ হয়।

ব্রহ্মবিদ্যা কী?

ভারতের চিন্তার ও সাধনার চরম লক্ষ্য তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা।

কঠোপনিষদের প্রেয় ও শ্রেয় মার্গের কথা তুলেই তা পরিষ্কার করা হয়েছে। নচিকেতা ও যমের কথোপকথনে এ তত্ত্বের অবতারণা। প্রেয়মার্গ সুখের পথ, শ্রেয়মার্গ মঙ্গলের পথ। প্রেয় মার্গ দেয় সুখ ও ভোগ। শ্রেয়মার্গ দেয় মুক্তির আনন্দ। প্রেয়মার্গের ফল সংসার, শ্রেয়মার্গের ফল মুক্তি।

প্রেয়মার্গের সাধনা যাগযজ্ঞাদির সাধনা। তা দেয় সূক্ষ্মভোগ স্বর্গাদি লোকে। এ সুখের সাধনায় মানুষ পায় নানাবিধ ঐশ্বর্য ও ভোগ, কারণ তার বেশী এর লক্ষ্য নয়। অন্তর-লোকের সূক্ষ্মতাসম্পাদনের দ্বারা কামনাকে পূর্ণ করাই পথের লক্ষ্য। এতে আছে সম্পদ ও ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি—নেই জ্ঞানের প্রশান্তি।

শ্রেয়মার্গের সাধনা ব্রহ্মসাধনা। এতে ভোগ নেই, আছে মুক্তি। ইন্দ্রিয়ের শাসনের দ্বারা, চিত্ত-সংযমের দ্বারা ব্রহ্মানুসন্ধানে তৎপর হয়ে ব্রহ্মসন্নিধি ও ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করা পরম শ্রেয়। প্রেয় সাধনার ভেতর আছে মানুষী ও

দৈবীবৃত্তি, শ্রেয় সাধনার ভেতর ব্রাহ্মী বৃত্তি। সত্য লাভে চিত্তবিশ্রান্তি। পরম সুখ তাই। প্রেয়ের অনুসন্ধানে আছে সূক্ষ্মভোগের আস্পৃহা ও চিত্তের চিরন্তন ভোগমুখী বৃত্তি।

এই শ্রেয় প্রতিষ্ঠার জন্যে দরকার অন্তঃসত্তার স্বচ্ছতা। দর্শন দেয় সত্যের পরিচয়। সাধনা দেয় সত্যপ্রতিষ্ঠা।

সত্য-জিজ্ঞাসার সঙ্গে চিত্তশুদ্ধির সম্বন্ধ। মানুষের স্বাভাবিক সংস্কার চালিত হয় প্রবৃত্তির নানা প্রেরণায়। এই সব প্রেরণা থেকে মুক্ত হয়ে সত্য-জিজ্ঞাসুর চিত্তবিশ্রান্তির আবশ্যক। চিত্ত শান্ত না হলে জ্ঞানের সূক্ষ্ম চিন্তা ও অনুভূতির দ্বার উন্মুক্ত হয় না। প্রাণের ও মনের স্তরে আছে কত আবর্জনা, কত বিরুদ্ধ সংস্কার যা সত্যদৃষ্টির পথে বাধা। এই আবর্জনারাশি থেকে মুক্ত না হতে পারলে সত্যপ্রতিষ্ঠা হয় না। মন, প্রাণ, হৃদয় বিশুদ্ধতায় পূর্ণ না করতে পারলে সত্যের বিমল শান্তি, অপরিমেয় তৃপ্তি, অপরাজেয় শক্তি লাভ করতে পারি না। প্রাণের বিশুদ্ধি দেয় শক্তি, বিজ্ঞান ও মনের বিশুদ্ধি দেয় দৃষ্টি, হৃদয়ের বিশুদ্ধি দেয় ধৃতি।

সাধনার কথা ইতিপূর্বেই ইঙ্গিত করেছি। উপনিষদের সাধনা প্রধানতঃ জ্ঞানের সাধনা। অবশ্য যোগের সাধনা ও ভক্তির সাধনাও এতে আছে। বিচারের পথে পাই জ্ঞানকে, ধ্যানের পথে পাই যোগকে। জ্ঞান বুদ্ধির জড়তাকে নাশ

ক'রে যোগযুক্ত করে। যোগ তপঃশক্তির সঞ্চার করে। মানুষের অন্তরে সত্যলাভের আস্পৃহা থেকে যে বৃত্তির স্ফুরণ তার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা সত্যকে ধারণা করবার শক্তি দেয়। সত্য-অনুসন্ধান ও সত্য-জিজ্ঞাসার সঙ্গে যদি সত্যের ধারণাশক্তি না থাকে তবে সত্য-প্রতিষ্ঠা হয় না। সত্যকে আহরণ করাই মুখ্য কথা নয়, সত্যকে ধারণ করাই মুখ্য কথা। সত্যের চিন্তা দেয় সত্যের আকর্ষণ : আকর্ষণ দেয় ধৃতি। এই আকর্ষণ ও ধৃতি হল শ্রদ্ধা। চিত্তের সাত্ত্বিক উৎকর্ষ থেকেই এই শ্রদ্ধার প্রতিষ্ঠা। উপনিষদে বলা হয়েছে "যাঁদের দেবতার ওপোর ও গুরুর ওপোর পরম ভক্তি আছে তাঁদের কাছেই সত্য প্রকাশিত।" এই শ্রদ্ধা অন্তঃসত্তাকে দৈবী সম্পদে পূর্ণ করে, চিত্তকে উন্মুক্ত করে। শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা এক অলৌকিক সম্পদ। তার শক্তি স্বতঃই সত্যাভিমুখী। কি জ্ঞানের পথ, কি যোগের পথ—সকলই শ্রদ্ধার ওপোর প্রতিষ্ঠিত। শ্রদ্ধা দেয় জ্ঞান, জ্ঞান দেয় সত্যের অকুণ্ঠ দৃষ্টি। শ্রদ্ধা থেকে আসে ধারণা। ধারণার গভীরতা থেকেই ধ্যানের উৎপত্তি।

যোগের দুটি রূপ আছে। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ এবং ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ। উপাসনার যে যোগ তাতে আমাদের অন্তর স্বচ্ছ হয়ে ঈশ্বর-সত্তাকে ও শক্তিকে অনুভব করে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়।

সর্বগত, বিভু পুরাণ-পুরুষকে তখন জানতে পারা যায়।

ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর অসীম সত্তার, বিরাট শক্তির, অপরিমেয় আনন্দের জ্ঞানলাভই যোগের চরমাবস্থা নয়। কারণ তখনও থেকে যায় তার সঙ্গে জীবাত্মার পার্থক্য-বোধ; কখনও সাধক ঈশ্বরীয় শক্তি দ্বারা এমন অভিভূত হয় যেন কোন পার্থক্যের বোধ থাকে না এটি অবস্থা বিশেষ। পার্থক্য স্বরূপতঃ থেকেই যায়, তবে যোগের গভীরতায় তা স্ফূর্ত হয় না। এ অবস্থা অধ্যাত্ম-জীবনের অতি উচ্চ অবস্থা, সাধক এই অবস্থায় তাঁর নিজের জীবনের ভেতর সাক্ষাৎভাবে অনুভব করে ঈশ্বরের সত্তা ও সংযোগ। ক্রমশঃ সে দিব্য-ভাবের বিভূতির ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়। কিন্তু এই ঐশ্বর্যাদি তার লক্ষ্য নয়। তার লক্ষ্য ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। যুক্ত হবার যে আনন্দ ও স্থিতি তা ঐশ্বর্যে নেই। যোগৈশ্বর্য প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা। ঈশ্বর-সংযোগে প্রকৃতির আবরণ দূর হয়। ঈশ্বর-সংযোগে ঈশ্বরের বা পরমাত্মার রূপ বা শক্তি বিশেষের বিকাশ হয়। যখন এই বিশ্বরূপের বিকাশও রুদ্ধ হয়, তখন সাধক তার ভেতরে ধ্যাতা ও ধ্যেয়কে হারিয়ে ফেলে। এক প্রশান্ত অমল জ্যোতির প্রকাশ হয়, যার উদয় নেই, অস্ত নেই, যা স্বয়ংপ্রভ, শাশ্বত, নির্ব্বিশেষ। জ্ঞানের এই হ'ল অত্যুচ্চ শিখর। কোন শক্তির স্পন্দন এখানে নেই, থাকে না। অথচ এ চিত্তের স্তব্ধভূমিও নয়। চিত্তের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ভাবের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। সে বাক্যের অতীত, মনের অতীত, সূক্ষ্ম ও কারণ-জ্ঞানেরও অতীত।

যোগদৃষ্টিতে জ্ঞানের অনেক সূক্ষ্ম ভূমিকা আছে যেখানে স্থূল জগৎ নেই, শক্তির তরঙ্গ যেখানে লীলায়িত। কিন্তু নির্বিকার প্রশান্তির স্তর নেই, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ জগতের কোন স্পন্দন সেখানে নেই, ব্যক্তাব্যক্তের অতীত সে। এই হল ঔপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যা।

ঔপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যা মানুষের স্বরূপের সঙ্গে পরমাত্মার স্বরূপের কোন ভেদ স্বীকার করে না। এই জন্যে মুক্তির ভূমিতে মানুষ উপলব্ধি করে আত্মার যথার্থ স্বরূপ তার মিথ্যা রূপকে ত্যাগ করে। এই মুক্তি অবস্থান্তরপ্রাপ্তি নয়, নিত্যস্থিতি। তাই উপনিষদে মুক্তিকে স্বরূপস্থিতি বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে একেই স্বারাজ্যসিদ্ধি বলা হয়েছে। আত্মার স্বরূপই স্বারাজ্য। এখানে মানুষ সকল ভয় থেকে উত্তীর্ণ হয়। জ্ঞানই মুক্তির প্রতিষ্ঠা। প্রাণ এখানে স্তব্ধ ও শান্ত, মন সংকল্প-বিকল্পহীন, সত্তাস্পন্দন রহিত—আকাশের মত স্তব্ধ ও মৌন, তবু ভাস্বর।

মুক্তির উপায়

মুক্তি যখন অজ্ঞানের তিরোভাব, তার প্রধান উপায় অজ্ঞানের অপসারণ; জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠা। জ্ঞানই মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। এই হল মুখ্য মার্গ। জ্ঞানই অজ্ঞানের নাশ করে, আলোই অন্ধকারকে করে দূর। জ্ঞান ভাবনাকে অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞানমার্গে মুখ্য ভাবনা 'আমি ব্রহ্ম'। এই ভাবনা আমাদের অন্তঃকরণে

O. P. 99—১২

বিরাটবোধ প্রতিষ্ঠা করে। ব্রহ্মাকাররূপে একটী বৃত্তির উদয় হয়। এই ভাবনা জীবভাবকে ক্রমশঃ অপসারিত করে এবং ব্রহ্মস্থিতি প্রতিষ্ঠা করে। জ্ঞান বস্তুতন্ত্র, বস্তুকে প্রকাশ করাই তার ধর্ম্ম। আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করলেও তার আত্মকেন্দ্রচ্যুতি হয় না। আত্মাই তো জ্ঞান।

ভারতের সাধনার এই চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অনেকেই উদাসীন। অনেকেই বলেন, এরূপ লক্ষ্যে কোনই লাভ নেই। জীবনের সকল আকর্ষণ এখানে স্তব্ধ, এবং সে জীবনে কার্য্যকরী হয়ে জীবনের সুখ বৃদ্ধি করে না। জীবনের চরম আদর্শ হবে জীবন—এর পূর্ণ সংবেগ, এর পূর্ণ তৃপ্তি, এর নিত্য কমনীয় বিকাশ। মুক্তি যখন সাবলীল জীবন-ছন্দকে অতিক্রম করে তখন তার সার্থকতা কোথায় ?

আপাততঃ কথাটি ঠিক বলে মনে হয়। কিন্তু পর্য্যালোচনা করলে এর সারবত্তা বুঝতে পারি না। মানুষের চরম লক্ষ্য হতে পারে প্রধানতঃ তিনটী :—(১) ক্রম-অভ্যুদয়ের গতি (২) ঈশ্বরের সঙ্গে, সকল আত্মার সঙ্গে সংস্থিতি (৩) মুক্তি।

গতিবাদীরা প্রথম লক্ষ্যকে গ্রহণ করেন ; এরা জীবনের নানা বিকাশ ও অভ্যুদয়ের পূর্ণতা দেখতে চান ; এর ভেতর একটা জীবনের লীলায়িত বিকাশের আস্পৃহা আছে, কিন্তু এতে কোনো স্থির লক্ষ্য পাই না। চলাই যদি জীবনের স্বরূপ হয়, তবে তা চিত্তে একটি কবিত্বময় প্রেরণা জগিয়ে তুলেও কোন

স্থির সিদ্ধান্ত দেয় না। জীবন হচ্ছে পথ। দার্শনিক দৃষ্টিতে এর কোন বিশেষ অর্থ নেই। জীবনের অভিজ্ঞতা বলে দেয় যে যাকে আমরা নবীন বলি সেটি প্রাচীনেরই পুনরাবৃত্তি। একটি অনির্দ্দিষ্টের দিকে ধাবিত হওয়ার ভেতর কৌতুকময় কল্পনার সঞ্চার থাক্‌তে পারে। কিন্তু জীবনের সৃষ্টিধারা কি শুধুই গতি? জীবনের সকল আকর্ষণ কি শুধুই গতির ওপরে? জীবন কি চায় না এই অনিশ্চিত গতি হতে মুক্ত হয়ে বিরাটের স্বরূপকে জান্‌তে? গতি আমরা চাই না, চাই ব্যাপকত্ব, বিরাটত্ব—যে বিরাটের ভেতর জীবনের সকল প্রবাহ, সব স্পন্দন গরীয়ান, মহীয়ান হয়ে ওঠে।

এই জন্যে ভারতের সাধনা কোনদিন কেবল গতিকেই লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেনি। গতির চেয়ে ছন্দের কথাই সাধনায় বড়। জীবনের ছন্দের ভেতরে পাই নানা বৈচিত্র্য, এবং সব বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে পাই একটা সুসঙ্গতি ও স্বাচ্ছন্দ্য।

সমষ্টিবোধের এই স্বাচ্ছন্দ্য যখন মানস-প্রত্যক্ষের কাছে প্রকাশিত হয় তখন ব্যক্তিগত জীবনের সকল সংকীর্ণতা. ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে, বিরাট জীবনের আনন্দ ও রসকে অনুভব করি। বুদ্ধি এই বিরাটের স্বরূপকে ধারণা করে, প্রাণ এর ছন্দে পূর্ণ হয়। এরূপ দৃষ্টিকেই মুক্তি বলা হয়। মুক্তি সত্যিই ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র আকুতি ও ক্ষুদ্র বাসনা থেকে নিষ্কৃতি।

ক্ষুদ্রতার তিরোধান হওয়া মাত্রই বিরাট বিজ্ঞানের সূত্র ধরতে পারি। ভারতীয় দৃষ্টিতে এরূপ আদর্শকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এরূপ আদর্শে সমষ্টিগত চৈতন্যের সঙ্গে বিশ্বের সকল সত্তার এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ সংযোগ।

মুক্তির এই ভূমিতে আমাদের সমস্ত বৃত্তিই অনন্তের অভিমুখী হয়। জীবনের চেষ্টা হয় সকল প্রকাশ ও গতির ভেতর দিয়ে অনন্তকে বরণ করা, আস্বাদ করা। ব্রহ্ম-স্বরূপ না হলেও, এ অবস্থায় জীব ব্রহ্মে বিচরণ করে।

কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টির এখানেই শেষ নয়। এ মুক্তি সংকীর্ণ জীবন হতে মুক্তি হলেও ব্রহ্মরূপ হওয়া নয়। দেশ ও কালের অতীত হয়ে পরিপূর্ণ চেতনার সন্ধান এ দেয় না। উপনিষদে এরূপ মুক্তির কথা থাকলেও একে সাধনার চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা হয় নি। কাল ও দেশের অতীত সর্ব্বসম্বন্ধশূন্য হয়ে চেতনার স্বরূপে অস্থিতিকেই চরম মুক্তি বলে গ্রহণ করা হয়েছে। চেতনার বিকাশ ছন্দে; কিন্তু জীবনের ছন্দের যেখানে লয় সেখানেই উচ্চতর সত্তার সন্ধান। জীবনের সকল চাঞ্চল্য যেখানে তিরোহিত, জ্ঞানের স্ফুরণ সেখানে নিত্য এবং সত্য সেখানে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত। ব্রহ্মের ও জীবের সেখানে কোন ভেদ থাকে না, থাকতে পারে না। এরূপ অবস্থার নাম সদ্যমুক্তি—চেতনার স্বরূপে স্থিতি। এরূপ মুক্তিতেই কাল এবং দেশের অতীত হয়ে চেতনার স্বরূপকে উপলব্ধি

করি। এ স্বরূপ আমাদের আত্মার স্বরূপ। জ্ঞানের এরূপ কাল ও দেশগত সংকীর্ণতা হতে মুক্তিই চরম মুক্তি।

মুক্তির উপায় সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু আভাষ দিয়েছি। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার অভেদ বুদ্ধি প্রতিষ্ঠাই মুক্ত হবার শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু এতো সহজে হয় না। এর জন্যে সাধনের প্রথম ভূমিকাতে চিত্তশুদ্ধি দরকার। চিত্তশুদ্ধ বাহ্য ও অন্তর ইন্দ্রিয় নিয়মিত করে। একেই বলে 'শম' ও 'দম'। এই শম ও দম দূরীভূত করে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য। উপাসনা দেয় মনের একাগ্রতা। উপাসনা গভীর হলে হয় ধ্যান ও ধারণা। তা থেকে চিত্ত সমাহিত হয়। সমাহিত চিত্তে জ্ঞানের স্ফুরণ।

যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের কথোপকথনে সাধনা সম্বন্ধে আরো স্পষ্ট উপদেশ পাই। যাজ্ঞবল্ক্য বাক্‌কে, প্রাণকে, চক্ষুকে, মনকে, বুদ্ধিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করবার উপদেশ দিয়েছেন। এরা ব্রহ্মের রূপ নয়, কিন্তু এদের ব্রহ্মরূপে ধারণা করবার ইঙ্গিত সর্বত্র আছে। বিশ্বের যাবতীয় শক্তিকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখলে তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়। প্রত্যেক বস্তু বা শক্তির ভেতর অনুগত আছে ব্রহ্মসত্তা। এই ব্রহ্মরূপ দৃষ্টিতে তাদের সত্তার ও শক্তির পূর্ণ স্ফুরণ। ব্রহ্মদৃষ্টি ব্যাপক-দৃষ্টি। এই দৃষ্টি থাক্‌লে সকল পদার্থের ব্রহ্মরূপের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়।

উপনিষদে বিশ্বের সকল পদার্থের ভেতর ব্রহ্মদৃষ্টি স্থাপিত

করার প্রয়াস আছে। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন সত্তা উপনিষদ স্বীকার করেন না। প্রত্যেকের ভেতর এই বিরাট ব্রহ্মদৃষ্টি যতই প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই তাদের রূপ বদলে যায়। ব্রহ্মবোধে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লে তাদের সূক্ষ্মতার, রমণীয়তার প্রকাশ হয়। এইরূপে প্রাণ, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি অধ্যাত্ম শক্তিগুলির, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্রমা, বরুণ প্রভৃতি অধিভূত শক্তিগুলিরও ব্রহ্মদৃষ্টিরূপে উপাসনার উপদেশ উপনিষদে আছে। এই উপাসনার দ্বারা এদের ব্রহ্মরূপ ও শক্তিরূপ জানা যায়। তখন সাধকের নানাবিধ যোগৈশ্বর্য লাভ হয়। শক্তিগুলির সংকোচ দ্রবীভূত হয়। সাধক নানাবিধ সূক্ষ্মজ্ঞানের আধার হয়। প্রাণের, মনের ও বুদ্ধির সূক্ষ্মতা ও সমতা সম্পন্ন হলে হয় অব্যাহত শক্তি। উপাসনা এইভাবে শক্তি জাগ্রত করে তোলে।

সপ্তান্ন বিদ্যায় এর ছায়া দেখতে পাই। কিরূপে বিষয়দর্শনের স্থলে ব্রহ্মদর্শন হয় তার জন্য এ বিদ্যার অবতারণা। সাত প্রকার অন্নের কথা এ বিদ্যায় উল্লেখ আছে। ভোজ্যদ্রব্য, জল, হুত, প্রহুত, মন, বাক্য, প্রাণ এই সপ্ত অন্ন। যারা দেবতার উপাসক তাহা ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন। তারা দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি করে থাকে। দেবতার উদ্দেশে হোমাদিকে হুত বলা হয়। অবশিষ্ট যা সকল ভূতকে বলিরূপে দেওয়া হয় তা প্রহুত। নিষ্কামভাবে এ দেবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হয়। ইহলোকে বা পরলোকের সুখকামনার নিষেধ আছে। অন্ন ও জল প্রাণিমাত্রের উপজীব্য।

যাঁরা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ও ব্রহ্মসাধনা তৎপর তাঁরা সকল বিষয়ে ব্রহ্মদৃষ্টি অভ্যাস করেন। তাঁরা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কামনায় ব্রহ্ম কর্ম্মে লিপ্ত হন। দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের স্থলে ব্রহ্মভাবনাত্মক যজ্ঞ সম্পাদন হয়। পদার্থের স্বতন্ত্ররূপ ব্রহ্মবুদ্ধিতে লয় হয়। পরবর্তীকালে এরূপ সাধনাকে দৃশ্যমার্জনা বলা হয়েছে।

সপ্তান্ন বিদ্যার সূক্ষ্ম মর্ম্ম এই। দেবকর্ম্মে একটি শক্তির সঞ্চার হয়। এই শক্তিকে লাভ করে' ইষ্ট সাধনা হয়। কিন্তু ব্রহ্মদৃষ্টি স্থির থাকলে এই শক্তির ভেতর ব্রহ্মের সন্ধান করা হয়; শক্তির আশ্রয় ত ব্রহ্ম। এই দৃষ্টি দেবাত্ম শক্তির রূপ পরিবর্তন করে দেয়। সাধক নিজেকে ব্রহ্মরূপে দেখে। দেবতাকে ব্রহ্মরূপে দেখে। অগ্নিকে ব্রহ্মরূপে দেখে। এরূপ ভাবনায় ব্রহ্মবোধের উন্মেষ। এরূপ ভাবে প্রাণের, মনের ও বাক্যের চেষ্টাকে ব্রহ্মরূপে দেখবার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এরূপে উপাসনাদ্বারা এদের স্বরূপ বুঝতে পারি। এবং ক্রমশঃই বুদ্ধির সূক্ষ্মতায় কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। একই শক্তি, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হচ্ছে। উপনিষদে এই শক্তিকে প্রাণ বলা হয়েছে, কখনও বা অব্যক্ত বলা হয়েছে—এই অব্যক্ত বা প্রাণ পরমাত্মা দ্বারা বশীভূত হয়ে বিশ্বরূপে পরিণত হয়। ব্রহ্ম ছাড়া এর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। কার্যরূপে নানা ভেদসম্পন্ন হলেও

কারণরূপে এক। এই ভাবে উপাসনাদ্বারা কার্যের ভেতর কারণের সন্ধান পাই। উপাসনা বিদ্যাবিশেষ। অন্তঃকরণকে নির্মল করে উপসানা বিষয়ের স্বরূপ-বোধ প্রতিষ্ঠা করে। প্রাণ, মন বুদ্ধিতে মনঃসংযোগ করে তাদের সূক্ষ্মসত্তার ভেতর কারণের সংবেগ অনুভব করি। এই উপাসনা একরূপ তত্ত্বানুপ্রবেশের কৌশল। এদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি প্রত্যেক পদার্থের মূল কারণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করে। অধ্যাত্ম অধিদৈব শক্তিগুলির পরস্পর সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ গভীর—এই সম্বন্ধকেই অবলম্বন করে উপাসনা দ্বারা প্রভূত শক্তি লাভ করা যায়। প্রাণোপাসনার দ্বারা বিশ্ব-প্রাণের পরিচয়, বুদ্ধির উপাসনার দ্বারা বিশ্ববিজ্ঞানের পরিচয়। এই অধ্যাত্ম ও অধিদৈবের পরস্পরানুযোগিতার ভেতর সাধক পায় বিশ্বজগতের সন্ধান। উপনিষদের উপাসনার বৈশিষ্ট্য এখানে; এ শুধু একটা ভাবাবস্থা নয়, এ দেয় বিরাটের জ্ঞান। অন্তঃশক্তির সঙ্গে বহিঃশক্তির একটা সামঞ্জস্যসূত্র আছে। এই সূত্রের ধারণা করতে পারলেই সাধক নিজের অধ্যাত্মশক্তিকে জাগিয়ে অধিদৈব শক্তির অধিকারী হতে পারে। এটি শক্তিবিজ্ঞানের পথ। এ পথ মানুষের শক্তিগুলিকে স্ফূর্তি দেয় এবং মানুষ ক্রমশঃ তার ভেতর পায় ঈশ্বরীয় শক্তির সাড়া ও ক্রিয়া। ঐশ্বর্যবোধের ভেতর থাকে একটি বিরাট রূপের জ্ঞান। অন্তঃজগতের ক্ষুদ্রতা ক্রমশঃ অপসারিত হয়ে সাধকের ভেতর বিরাটের সত্তা জাগ্রত হয়। উপনিষদের সাধনার (এমন কি উপাসনা প্রকরণেও) থাকে একটি অভেদ দৃষ্টি। এই দৃষ্টি

ক্রমশঃ আমাদের ভেতর বিশ্বশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রাণ বিশ্বপ্রাণের, মন বিশ্বমনের, বুদ্ধি বিশ্ববুদ্ধির সঙ্গে একত্বপ্রাপ্ত হয়ে বীর্যে পূর্ণ হয়, জ্ঞানে দীপ্ত হয়। উপাসনা শুধু অভেদ দৃষ্টি দেয় না। উপাসনা দেয় সাধকের একটা বৃহত্তর স্বরূপের মানস-প্রত্যক্ষ। অন্তর বাহির ভেদ যখন লয়প্রাপ্ত হয়, তখনই সাধক বিশ্বের অন্তর্যামী পুরুষের সঙ্গে হৃদয়ের অন্তর্যামী পুরুষের অভিন্নতা অনুভব করে। তখন সে বলতে পারে, আমি সূর্যে, আমি চন্দ্রমায়। প্রাণ, মন, বুদ্ধিকে অতিক্রম করে সাধক সূক্ষ্ম অবস্থায় উপনীত হয়ে এই বিশ্বাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বশক্তির সঙ্গে আত্মশক্তির অভিন্নতাবোধে সাধকের অগ্রগতি। সাধকের অন্তঃকরণের শুদ্ধি হলেই তেজোময় ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার ভেতর প্রত্যেক শক্তির বিরাটরূপের ধারণা জাগে। এই ধারণা বিশেষ শক্তির কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করে। এই ধারণা দৃঢ় হলে সাধকের কাছে প্রতিভাত হয় বিশ্ব-চক্রের শৃঙ্খলা, গতি ও নিয়ামক শক্তি। এই জন্যই উপনিষদে উপাসনার একটা বিশেষ অর্থ আছে। প্রাণের, মনের বুদ্ধির শুদ্ধতায় বিশ্বজ্ঞানের উৎপত্তি। তার আছে বিশ্বরূপের সংবেদনশক্তি। এই সংবেদনশক্তি দেয় বিরাট বা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা।

ব্রহ্মসন্ধানে অন্তর বৃত্তিগুলিকে, প্রকৃতির শক্তিগুলিকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করা হয়েছে। এতে সমস্ত শক্তিগুলির সঙ্গে পরিচয়, এমন কি এদের সার্বভৌমিকতার অনুভূতি।

এইভাবে বাক্, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান সকলকেই ব্রহ্ম বলা হয়েছে এবং ব্রহ্মবোধে তাদের উপাসনার কথা আছে। তাতে ব্রহ্মস্বরূপের অবতারণা না হলেও, অন্তরের বিকাশ হয়। এভাবে পরিজ্ঞান হলে একটা সমষ্টি জ্ঞানের অধিকারী হই। বাক্য হয় দিব্য প্রজ্ঞার স্ফুর্তি, প্রাণ হয় অসীম শক্তির আধার, বিজ্ঞান হয় বিশ্ববিজ্ঞানের আধার। জ্ঞান সাধারণ ভাবকে অতিক্রম করে একটা অসাধারণ রূপ নেয় এবং বিরাটের অববোধে আমাদের পূর্ণ করে। জিত্বা, উদঙ্ক, বর্কু, গর্দভী-বিপীত, সত্যকাম, বিদগ্ধ জনককে যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন তার সার মর্ম এই। বাক্‌ব্রহ্ম, প্রাণব্রহ্ম, চক্ষুব্রহ্ম, শ্রবণশক্তি ব্রহ্ম, মনব্রহ্ম, বুদ্ধিব্রহ্ম। এ থেকে প্রত্যেক বৃত্তি শক্তিকে যে ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করে তার ভাবনা দ্বারা ব্রহ্ম-সংযোগ অনুভব করা যায়, এ কথা শ্রুতিতে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রত্যেক শক্তিকে ব্রহ্মরূপে দেখা ব্রহ্মবোধে সহায়ক। বিশেষরূপে বিজ্ঞানোপাসনা, প্রাণোপাসনা ও বাক্-উপাসনার কথা বলা যেতে পারে। এদের ভেতর একটা সূক্ষ্ম সম্বন্ধ আছে। বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত প্রাণ-সঞ্চার বাক্‌রূপে প্রকাশ পায়। বাক্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

বিজ্ঞান উপাসনা

বিজ্ঞানরূপে ব্রহ্মের উপাসনা, প্রাণরূপে ব্রহ্মের উপাসনা, এবং বাক্‌রূপে ব্রহ্মের উপাসনা সাধনার পথে মূল্য আছে। ব্রহ্ম বিশ্ববিজ্ঞানময়। বিজ্ঞান প্রকাশশীল বস্তু। ব্রহ্মরূপে

বিজ্ঞান উপাসনায় চিত্ত-বিজ্ঞানের আলোতে হয় উদ্ভাসিত। এ আলো অন্তর হতে প্রসৃত হয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এ আলোকে বিশ্বের ঘন আবরণ হয় দূরীভূত। বিশ্বের অন্তর হয় অনাবৃত। চিদাকাশে বিশ্বময় বিজ্ঞানের স্ফূর্তিতে সাধক হয় তৃপ্ত। বিজ্ঞানের এ প্রভা অনবচ্ছিন্ন ও অখণ্ড।

বিজ্ঞানে যা প্রকাশ, প্রাণে তা শক্তি। বিজ্ঞানের সাথে সাথে প্রাণ হয় শান্ত এবং ব্যাপক; সমস্ত চাঞ্চল্যরহিত হয়ে মহাপ্রাণ সঞ্চার করে। এই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, মানুষের ক্ষুদ্র সংকল্প বিকল্প মহাপ্রাণে নিমজ্জিত হয়ে ঈশ্বরীয় সংকল্পের আধার হয়। এখানে সংকল্প মাত্রই সিদ্ধ হয়। মহাপ্রাণের প্রতিষ্ঠায় বাকের সূক্ষ্মস্তরের অবতারণা। বাক্ হয় তখন ছন্দের বাহন এবং ছন্দবদ্ধ বাকেই মন্ত্রের উৎপত্তি। ছন্দবদ্ধ বাক্ই শ্রুতি। এই অশরীরী বাক্ মহাশক্তির আধার এবং এর স্ফূর্তিতে সিদ্ধি। সৃষ্টি এইরূপ বাকেই উদ্ভূত। সংকল্প বাক্ ও সৃষ্টির ভিতর পরস্পরে সংযোগ সূত্র আছে। সূক্ষ্ম প্রাণের স্পন্দনে সংকল্পের উৎপত্তি। সংকল্প বাক্‌রূপে পরিণত হয়ে জগতের সৃষ্টি করে।

মানুষের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে স্বাভাবিকরূপে যে প্রেম স্ফূর্তি হয়, তা অন্তর্বেদনা হতে পারে—প্রেম নয়। ওঠা যেমন যেমন মানুষকে মানুষের জন্য উদ্বোধিত কর, তেমনি মানুষকে, আঘাত পেলেই, মানুষ হতে বিচ্ছিন্ন করে। ওঠা জীবনের সাধারণ বৃত্তি যা প্রাণস্তরে অনুভূত হয়। প্রেম আত্ম-নিষ্ঠ,

আত্ম-কেন্দ্রিক—আত্মার উজ্জ্বলতায় সে উজ্জ্বল, তার ব্যাপকতার সংকোচ কখনই হয় না। সে সকল বিরুদ্ধ অবস্থা অতিক্রম করে তার সর্বস্ব দিয়ে তার বিষয়কে সঞ্জীবিত করে তোলে। প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী, প্রেমের স্পর্শে জীবনের উৎস খুলে যায়, জীবন আনন্দের লহরীতে পূর্ণ হয়। প্রেম শক্তিমান—খাঁটি প্রেমেই জগতের বিরোধ ও সংকীর্ণতার জঞ্জাল নষ্ট করতে পারে। জীবনের ভেতর জীবনকে, চিরপুরাতনে চিরনবীন—জাগিয়ে বিশ্ব-প্রাণকে সমৃদ্ধ করতে পারে। প্রেম তার সম্প্রসারিত বক্ষে জগৎকে আলিঙ্গন করে মৃত্যুর ভেতর জীবনকে, কুৎসিতের ভেতর সুন্দরকে, অকল্যাণের ভেতর শিবকে জাগিয়ো তুলতে পারে। প্রেম উদার, মৃত্যু সঞ্জীবণী শক্তিতে পূর্ণ।

উপনিষদের সাধনায় একটা স্বাভাবিকতা আছে। সেটি হচ্ছে আমাদের স্বরূপের ভেতর বিরাটের আস্পৃহা। এই আস্পৃহার পরিচয় পেলে সাধনা অত্যন্ত সহজ হয়। তখন স্পষ্টানুভূতি হবে, অন্তরের কোন ক্ষুদ্র আশয়ে আমরা তৃপ্ত হই না, হতে পারি না; কারণ তা আমাদের স্বভাব-বিরোধী। আমাদের স্বভাব হচ্ছে, বিরাটকে অনুভব করা—শুধু অনুভব করা নয়, বিরাট হওয়া। উপনিষদের সাধনার আকর্ষণ ও বৈশিষ্ট্য এখানেই। উপনিষদের সাধনা একটা স্তরে "নেতি" "নেতি" সাধনা থাকলেও একে শুধু অভাবমূলক সাধনা বলা যায় না। উপনিষদ ব্রহ্মের বিশ্বরূপ দেখেছে বলে, তার সাধনার ভেতর বিরাটজীবনের আকর্ষণ আছে। এই সাধনা ব্রহ্মকে সর্বত্র পায়, কিন্তু এতেই তৃপ্ত

হয় না। এই ব্রহ্মদৃষ্টিতে অন্তরে ব্রহ্মাকর্ষণ, পরিণতিতে ব্রহ্মের ঐক্যলাভ। এ অবস্থা এমনি যে সাধক এখানে ব্রহ্মদৃষ্টিকে অতিক্রম করে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়। সাধনার জীবনে এই পরিণতি চরম। এই প্রকৃত তত্ত্বানুভূতি।

উপনিষদের সাধনার আরম্ভ, বিষয়ে ব্রহ্মদৃষ্টি থেকে। ব্রহ্মদৃষ্টি স্থাপন হলে আত্মদৃষ্টিও স্থাপিত হয়। ব্রহ্মদৃষ্টি পদার্থের আনন্দময় স্বরূপ আমাদের কাছে উপস্থিত করে। আমাদের অন্তঃকরণও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে একটি দিব্য দীপ্তিতে। ক্রমশঃই স্থূলভাব—কি বিষয়ের, কি অন্তঃকরণের—দূরীভূত হয়। এবং সকলের ভেতর দিয়ে ব্রহ্মসংস্পর্শ অনুভব করি। এটি কল্পনা নয়। ইহা সত্যদৃষ্টি ও অনুভূতি। এরূপ অবস্থা লাভ হলে সাধক আরও উচ্চস্তরে উপনীত হয়। এরূপ দৃষ্টিলাভ হলেও সাধকের অন্তরের অনেক বাধা অপগত হয়। সে হয় স্বচ্ছ। স্বচ্ছ অন্তর ভিন্ন পদার্থের ব্রহ্মরূপ অন্তরে প্রতিফলিত হয় না। অন্তরেও ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয়; তাতেই অন্তর সত্ত্বের শক্তিতে পূর্ণ হয়। এ জন্যই উপনিষদে প্রাণ, মন, বিজ্ঞানের উপাসনার কথা বলা হয়েছে এবং তত্ত্বগুলির, আকাশ, বায়ু, বরুণ, অগ্নির উপাসনার কথা আছে। উদ্দেশ্য সবগুলিকেই ব্রহ্মময় করে তোলা। এতে সাধক জ্ঞান ও শক্তি দুই-ই লাভ করে।

উপাসনার উদ্দেশ্য শুধু আনন্দ সঞ্চার নয়, উপাসনা আনে জ্ঞানের বিকাশ। তত্ত্ববোধ ভিন্ন শুধু ভাবোচ্ছ্বাসের স্থান

উপনিষদের উপাসনায় নেই। এই জন্যই প্রত্যেক উপাসনাটি বিজ্ঞানবিশেষ। ইহারা অনুভূতির স্তরবিশেষে সত্যের কোন রূপ প্রকাশ করে। এক এক বিদ্যায় এক এক উপলব্ধির কথা আছে। উপাসনায় স্থূলে ব্রহ্মবোধ হতে পারে, স্থূলে ব্রহ্মবোধ স্থিতিলাভ করলে সূক্ষ্মে ব্রহ্মবোধ হতে থাকে। স্থূল সূক্ষ্ম বিশ্বে ব্রহ্মস্বরূপতা সুস্পষ্ট হলে আরও সূক্ষ্মানুভূতির অভিমুখে গতি হয়। এইরূপে নানাবিধ লোক অতিক্রম করে, বিরাট ও হিরণ্যগর্ভলোক অতিক্রম করে সগুণ ব্রহ্মানভূতিতে মগ্ন হই। প্রাণের, মনের বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে এ লোক ; জ্ঞানময়, ঋতময়, আনন্দময় সত্তায় এ লোক পূর্ণ।

এখানে উপাসনার ফলগুলি নির্ণীত হচ্ছে। প্রাণোপাসনা দ্বারা প্রাণশক্তির ধারণা বর্ধিত হয় এবং বিশ্বপ্রাণের শুদ্ধতার ও শান্তিকে লাভ করি। প্রাণশক্তি শান্ত হওয়ায় বৃত্তিও শান্ত হয়ে আসে। শুধু কি তাই? বিশ্বপ্রাণের সঞ্চারে আমাদের স্বভাবজাত প্রবৃত্তিও শান্তভাব ধারণ করে এবং বিশ্বপ্রাণের নিস্তরঙ্গ অবস্থাকে অনুভব করে আনন্দ লাভ করে। উদ্বেলিত প্রাণশক্তি শান্ত হলে তার শক্তি বৃদ্ধি হয় ও জ্ঞানসাধনার পথ খুলে যায়। এই জন্যেই প্রাণোপাসনার আবশ্যক।

তেমনি মনের উপাসনায় আমাদের সূক্ষ্মপ্রাণ, সংকল্প, বিকল্প, শান্ত হয়ে আসে। সংকল্পের গতি হয় অপ্রতিহত। সূক্ষ্ম বিজ্ঞান দেয় বিশ্ববিজ্ঞানের পরিচয়। এই শক্তিগুলি

সম্যক নিয়মিত হলে অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা ও সূক্ষ্মতার সঙ্গে বিরাটের সত্তা ও শান্তিকে অনুভব করি। সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর, স্বচ্ছ হতে স্বচ্ছতর লোকের প্রকাশ হয়। উর্ধ্বলোকগুলি মানসানুভূতি বেদ্য নয়, অথচ সত্তার শুচিতায় ও স্বচ্ছতায় স্বতঃই প্রকাশিত। এই উর্ধ্বগতির শেষ সীমা সগুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং 'অপহতপাপ্মা' ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি। এখানে শান্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্যে সাধক পূর্ণ হয়। উপসনামার্গে সাধকের দিব্যপথে গতি। এই হল দেবযানমার্গ।

নানাবিধ উপাসনার মধ্যে দহর আকাশের উপাসনা অত্যন্ত সুখকর ও ফলপ্রসূ। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এক তেজোময় অবকাশের অবস্থিতি। একেই দহরাকাশ বলে। এ আকাশে প্রবেশের দ্বার হৃদয়-গুহা. ধ্যানের প্রশস্ত ক্ষেত্র এই। ভ্রূমধ্যে ধ্যানের কথা যোগশাস্ত্রে আছে—কিন্তু হৃদয়াকাশে ধ্যান উপদ্রব রহিত ও অনায়াসসাধ্য।

দহরোপাসনা

এতে সাধক হৃদয়-গুহায় অবস্থিত হয়। (হৃদি হ্যেষঃ আত্মা)। দহরাকাশে মন বিলীন করে ব্রহ্মধ্যান করতে হয়। হৃদয় ধ্যানের প্রশস্ত ক্ষেত্র ; একে আনন্দ-গুহাও বলা হয়। এখানে গভীর ধ্যানে তত্ত্বের প্রকাশ। সঙ্কল্পানুযায়ী সব ইচ্ছার সিদ্ধি। হৃদয়কে কেন্দ্র করে ধ্যান করলে সাধকের কাছে অতি শীঘ্রই একটা অখণ্ড স্বচ্ছ ব্যপকতার প্রকাশ

হয়। হৃদয় বলতে আমরা হৃদয়ের অবকাশই বুঝব। এ অবকাশের সীমা নেই। ধ্যান গভীর হলেই এর উপলব্ধি পাই। শুধু তাই নয়, ধ্যানের গভীরতায় এই হৃদয়-গুহা হতে উর্ধ্বে প্রসারিত একটি সূক্ষ্ম পথের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। সাধক এই পথে বিচরণ করতে সক্ষম হলে তেজোময় সত্তার সঙ্গে পরিচিত হয়; এবং ইচ্ছানুযায়ী শরীর হতে নিষ্ক্রান্ত হতে পারে। এই পথ অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু এর পরিজ্ঞান থাকলে সাধকের জ্ঞান হয় অপরিসীম, গতি হয় অপ্রতিহত—কারণ এই পথে তাদের দিব্য জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ, যার কোন তথ্য মনের দ্বারা বা বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে পারি না। দহরাকাশে চিন্তার ফলে সাধক অধ্যাত্মানুভূতি-সম্পন্ন হয়; এবং তার অলৌকিক জ্ঞান হয় যা সত্যে উদ্ভাসিত, সতত প্রকাশশীল। কর্ম একে স্পর্শ করতে পারে না। সাধারণ বিজ্ঞান একে বুঝতে পারে না। এ স্বতঃস্ফূর্ত ও দিব্য।

এই ভাবে অহংকারের নাশ হয়। তখন অনুভব করি এক স্বচ্ছ সর্বব্যাপী অস্মিতা * বোধের প্রকাশ। এই বোধ দ্যোতনশীল। এ বোধকে সূত্র করেই জ্ঞানের বৃহত্তর ও দিব্যতর সত্তার প্রকাশ। শ্রুতিতে আছে "প্রাণের

* "অস্মিতা" কথাটি পাতঞ্জলে ব্যবহৃত হয়েছে। 'অস্মিতা' আমিময় জ্ঞান বৃত্তি। এই বৃত্তি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুখময়। এই বোধে সম্যক প্রতিষ্ঠা হলে হৃদয় হতে উর্ধ্বে জ্ঞান বিকাশ ক্রমশ বিশ্বময় বোধে পর্যবসিত হয়। বিরাট পুরুষের পরিচয় হয়। যোগশাস্ত্রে একেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ বলা হয়েছে।

অন্তরে যিনি বিজ্ঞানময় মহান আত্মা, যিনি অন্তর হৃদয়াকাশে অবস্থিত, তিনি সকলের অধিপতি, ঈশান।” অন্যত্র আছে, সমাধি দ্বারা পাপপুণ্যের অতীত আত্মজ্ঞ, বিজ্ঞানময় সর্বাধিপতি ব্রহ্মলোক স্বরূপ হন।

দহরাকাশ ব্যাপক, উর্ধ্বে যেমন স্বচ্ছ, বিশাল হয়, অধেও তেমনি। স্বচ্ছ শান্ত জ্যোতিতে আধারের উর্ধ্ব ও অধঃ দেশ পূর্ণ হয়। অনুভবের গভীরতায় এই স্বচ্ছতা এমন বিকাশশীল হয়ে সমস্ত চিত্তকে প্রতিফলিত করে। এই স্বচ্ছতায় উর্ধ্ব-দেশ, অধদেশ, মধ্যদেশ প্রকাশিত হয়; এক অখণ্ড জ্যোতিঃ ধারা সত্তাকে প্লাবিত করে—তার সাক্ষী হয়ে ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া যায়। এই জ্যোতিধারায় অপার্থিব সিদ্ধির আবির্ভাব হয়, কিন্তু উদাসীন দৃষ্টির স্থিরতায় আত্মতত্ত্বের উদয় ও প্রকাশ।

উপাসনায় সিদ্ধ হলে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের পরিচয়। এ জ্ঞান অস্মিতাকে দ্বার করেই হয়। ‘অস্মিতা’ বোধ অত্যন্ত সূক্ষ্ম বোধ। এই অস্মিতা সূত্রের সাথে বিরাট মহানাত্মার সম্বন্ধ আছে। এই বিরাটের সাক্ষী হতে পারলে ব্রহ্মবোধ প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানে লীন হয় কেন্দ্রীভূত ‘অস্মিতা’। অস্মিতার অনুসন্ধান দেয় অপার্থিব জ্ঞানের পথ। অস্মিতার সাক্ষী-দৃষ্টি দেয় দিব্য জ্ঞানের বিভব ও বিস্তৃতি হতে মুক্তি। জ্ঞানপথের সাধক এইভাবে উপাসনাকেই অবলম্বন করেও স্থিতি গ্রহণ করতে পারে।

অহংগ্রহ উপাসনা

উপনিষদে আর একটি উপাসনার কথা বলা হয়েছে—"অহংগ্রহ উপাসনা"। এই উপাসনার একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং ইহা ব্রহ্মানুভূতির খুব সহায়ক। অন্যান্য উপাসনায় বাইরের পদার্থের উপর ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয়—কিন্তু এই উপাসনায় নিজের সক্রিয় সত্তার উপর ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয়।

মানুষের অহংবৃত্তি তার শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের উপর সঞ্চারিত এবং এদের ভিতর আবদ্ধ। উপনিষদের দৃষ্টিতে এই অহংবৃত্তি প্রসারীভূত ও ব্যাপক হতে পারে। ব্যাপক হলেই অন্তরের সঙ্কোচবৃত্তি হতে মুক্ত হয়।

এর প্রণালী এই। কোন পদার্থে মনোসংযোগ করা। তার ভেতর "আমি"-বোধ জাগিয়ে তোলা। এমনভাবে জাগান যে তার সহিত এই আমি-বোধের কোন ভেদ না থাকে। এতে আমি-বোধটি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হয়ে সেই পদার্থের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এইভাবে আমি-বোধের আরোপ সকল পদার্থের উপরেই করা যায় এবং ক্রমশঃ সকল পদার্থের সত্তা এই আমি বোধে বিলীন হয়। সূর্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করলে এই আমি-বোধের ভেতর বিশ্বের স্ফূর্তি। পবনে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করলে শক্তির স্ফূর্তি। এবং এই আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্যক্ দৃঢ় হলে সমস্ত বিশ্বই আমি-বোধের অন্তর্গত হয়ে উদ্ভাসিত হয়। তখন সবই যেন আমার অন্তর্গত, আমাতেই বিকসিত, আমাতেই স্থিত।

উপনিষদের সাধনায় ইহাই বৈশিষ্ট্য। সকল পদার্থকে আত্মরূপে দর্শন করতে করতে নিজের শুদ্ধ ও বিরাট স্ফুর্ত্তি। দেশ ও কালের ভিতর আত্মবুদ্ধি আর বদ্ধ থাকে না।

এ অনুভূতির মূল্য অনেক। মানুষের স্বাভাবিক ধারণা, জগৎ আমাদের বাইরে। কিন্তু এ উপাসনায় এ ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেয়। বিষয়ী ভাবকে ব্যাপক করে তোলে। ইহাতে বহুবিধ যোগ বিভূতিসঞ্জাত হয়। আমি-বোধরূপে যে পদার্থের উপর দৃষ্টি পড়ে, সেই পদার্থে তার শক্তি বিস্তারিত হয় এবং সেই পদার্থের স্বায়ত্তীকৃত হয়ে তার আবরণ থাকে না এবং সেখানে চিত্তেরও কোন সঙ্কোচ থাকে না। এজন্য চিত্তের শক্তি সেই পদার্থকে অভিভূত করে।

এইভাবে বিশ্বের উপর সত্য প্রতিষ্ঠা করতে করতে বিশ্বের কঠোরতা ও বন্ধুরতা বিগলিত হয় এবং বিরাট অহং সমুদ্ভাসিত হয়।

প্রণবোপাসনা

ধ্যানকে সরস ও সরল করবার জন্যে উপনিষদে প্রধান উপদেশ হচ্ছে ব্রহ্মের কোন প্রতীক্ (চিহ্ন) অবলম্বন করে উপাসনা। প্রণব, গায়ত্রী মন্ত্র, বহু প্রতীক্ আছে। সকল পদার্থই প্রতীক্ হতে পারে। কিন্তু সাধারণ প্রতীক্ও মন্ত্র প্রতীকের

ভেতর একটু পার্থক্য আছে। সাধারণ প্রতীক্ কোন ভাবনা জাগায় না, বরং ভাবনা দ্বারা তাদের করতে হয় প্রাণবন্ত। কিন্তু গায়ত্রী, প্রণব মন্ত্রের ভেতর আছে অন্তর্নিহিত শক্তি যা আমাদের ভাবনাকে সাহায্য করে, এবং আমাদের বৃত্তিকে দিব্য করে ও রমণীয় করে তোলে। ভাবনার সঙ্গে মন্ত্রের ছন্দের যোগ হওয়াতে ধ্যান হয় গভীর ও সহজ। মন্ত্রাচার্য্যেরা বলে থাকেন, প্রত্যেক মন্ত্রটি শক্তিবিশিষ্ট। অন্তঃকরণে শান্ত ও সূক্ষ্মভাবে প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করে।

শব্দের তরঙ্গ চিত্তে ভাবনা জাগিয়ে তোলে। এটি মানস প্রত্যক্ষ। মন্ত্র সূক্ষ্মপদার্থের দ্যোতক, অলৌকিক অনুভূতি ও জ্ঞান দেয়। এরূপ অলৌকিক অনুভূতিকে অবলম্বন করে শিষ্টেরা বলে থাকেন, 'প্রণব' ব্রহ্মের জ্ঞাপক। এই মন্ত্র অন্তঃকরণকে এমনভাবে ছন্দোবন্ধ করে যে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎকে প্রকাশ করে কারণাতীত ব্রহ্ম-বোধ দেয়। শব্দসাধনা অধ্যাত্মরাজ্যে আজও বর্তমান। এ সাধনায় অন্তঃকরণের পরিণতি সহজেই হয়। অন্তঃকরণের সূক্ষ্মাবস্থাগুলি খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক মন্ত্রের আকর্ষণী শক্তি আছে। চিত্তের সূক্ষ্ম পরিণতির সঙ্গে জ্ঞানের সূক্ষ্ম ভূমিগুলির প্রকাশ। মন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি চিত্তের সব আবর্জ্জনা দূরীভূত করে। প্রাণ মন-কেন্দ্র হতে চেতনাকে মুক্ত করে বিজ্ঞান ও তদূর্ধ্ব কেন্দ্রে উন্নীত করে, বিশ্বাধারের অপরোক্ষ জ্ঞানের

সঞ্চার করে। এ কল্পনা নয়, সত্য প্রতিষ্ঠা। বিশ্বছন্দে জ্ঞানের পরিসর বাড়িয়ে দিব্য মর্যাদায় মণ্ডিত করে। প্রণব মন্ত্র এরূপ যোগবিভূতি সম্পন্ন করলেও এর পরমস্থিতি কিন্তু এখানেই নয়। এর এমন শক্তি আছে যে সত্তার স্বচ্ছতা সম্পাদন করে, মহাপ্রাণের নিস্তরঙ্গ নিথর অবস্থাকে অতিক্রম করিয়ে মৌনস্তব্ধতায় প্রতিষ্ঠিত করে। ব্রহ্মই সনাতন স্তব্ধতা। এই স্তব্ধতায়, এই শান্তিতে, সৃষ্টির উল্লাস নেই, ধ্বংসের বিক্ষোভ নেই, স্থিতির সমতা নেই। এখানে চেতনা সকল উপাধিশূন্য, নির্ব্বিকার। এ সাধনার বৈশিষ্ট্য এই যে জ্ঞানের নিম্নতম-ভূমিকা হতে উচ্চতম ভূমিকা পর্যন্ত সকল ভূমিকার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়। এ দেয় ঈশ্বরের জ্ঞান ও ব্রহ্মস্থিতি। এই উচ্চতম অবস্থা সম্ভব হয়, যখন সাধক সাধনার পথে অবলম্বন করে উদাসীন দৃষ্টি এবং কোন অবস্থা-বিশেষের শক্তি, ভূতি ও আনন্দে আকৃষ্ট হয় না। চিন্মাত্র সত্তার অবস্থিতি যখন পরম লক্ষ্য, তখন সাধনার অবস্থা-বিশেষ হতে উদ্ভূত হয় যে দীপ্তি ও শক্তি তার দিকে আকৃষ্ট হলেই সাধনার শক্তি অবরুদ্ধ হয়ে আসে। সাধক মুক্তির চরম স্থিতি হতে চ্যুত হয়। তাই সাধকের সকল অবস্থাতেই অবলম্বন করে চলতে হয় একটা শান্ত, অচঞ্চল, আসক্তিহীন দৃষ্টি। তাই তাকে রক্ষা করে জীবনের সকল আবর্ত হতে। এরূপ সাধনা সম্ভব হলে বিজ্ঞান, আনন্দ, অস্মিতা, সকল অবস্থাকে অতিক্রম করে সাধক নিরুপাধিক সত্তা ও চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হল পরম ধৃতি।

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হতে হলে অন্তঃকরণের কোন অবস্থাতে অনুরক্ত হতে নেই। সাধনার পথে নানা মনোরম বিকাশ হয় অন্তরে। সাধকের এরূপ বিকাশেরও সাক্ষী হতে হয়। এরূপ বিকাশে আকৃষ্ট হলে জ্ঞানের নির্বিকার ভাবের লাভ হয় না। এজন্যেই সাক্ষী ভাবকে সাধকের সব অবস্থাতেই রেখে চলতে হয়। বেদান্তবিদেরা এই জন্যেই সাক্ষীতে প্রতিষ্ঠিত হবার উপদেশ দিয়েছেন। অনাবৃত চেতনায় যে সুখ তা কোথাও নেই। স্বচ্ছতা ও সূক্ষ্মতা-সম্পন্ন হলেই তার পরিণতি হয় বিরাটে। এ বিরাটজীবনের যে সম্পদ আছে তার ওপোরও ঔদাসীন্য না থাকলে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠার অপরিমেয় শান্তি পাওয়া যায় না। সাক্ষীসূত্রকে ধরে রাখতে হয়। নতুবা মূল শক্তির আকর্ষণে এই পরমপদ হতে হয় চ্যুতি। জ্ঞানের সাধনায় যত এই সাক্ষীর ঔদাসীন্যকে রাখতে পারা যায়, ততই আমরা অগ্রসর হই। বিশ্বপ্রকৃতি তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে উপস্থিত হয়। পরা বৈরাগ্য স্থাপিত হলে সে ঐশ্বর্য আর আমাদের আকৃষ্ট করে না। তখনই প্রকৃতি দেয় আমাদের মুক্তি। আত্মরূপে অবস্থিত হয়ে সাধক তার স্বরূপ উপলব্ধি করে এবং স্বরূপে স্থিত হয়। এই “মহিমা”।

গায়ত্রী

ছান্দোগ্য উপনিষদে গায়ত্রী সাধনার কথা আছে। গায়ত্রী ছন্দ। ব্রহ্মোপাসনার এই প্রধান অবলম্বন। আচার্য শঙ্কর

বলেছেন অনেক প্রকার ছন্দ আছে, তার মধ্যে গায়ত্রী ছন্দই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রধান দ্বার।

"গায়ত্রী বাক্‌রূপা (বাক্‌বৈ গায়ত্রীতি)"। শিষ্টেরা বলে থাকেন এ মন্ত্রের গান করলে মুক্তি হয় বলেই একে গায়ত্রী বলে।"

গায়ত্রীমন্ত্রে বিরাটের স্বরূপের দ্যোতনা করা হয়েছে। এ মন্ত্র বিরাটের উপাসনা। বিরাটের রূপকে প্রকাশ করে। এ মন্ত্রে এমন ছন্দ যা অন্তঃসত্তাকে বিশালভাবে পূর্ণ করে; প্রাণ ও মনকে শান্ত করে, তার ভেতর জাগিয়ে তোলে বিরাট সত্তার স্পন্দন। এ স্পন্দন হতে হয় বিরাটের জ্ঞান।

প্রত্যেক মন্ত্রের এরূপ স্পন্দন সৃষ্টি করবার শক্তি আছে। এ স্পন্দনের ভেতর থাকে একটি স্বাচ্ছন্দ্য। কারণ মন্ত্র ছন্দে যুক্ত।

মন্ত্র বিশেষে ছন্দের রূপ হয় ভিন্ন। সব মন্ত্রই একরূপ ধৃতি জাগায় না। যে সব মন্ত্র শক্তির ছন্দকে জাগায় তারা দ্যোতনশীল, জ্ঞানের দিকে তারা নিয়ে যায়। কোন কোন

এদেশে পরবর্তীকালে উপাসনা-বিজ্ঞান আরও প্রণালীবদ্ধ হয়েছে। প্রত্যেক উপাসনার ছন্দ, মন্ত্র ও দেবতা আছে। মন্ত্র করে শক্তির সঞ্চার। শক্তি প্রাণ, মন, বিজ্ঞানের ছন্দ প্রকাশ করে। ছন্দবদ্ধ অন্তর হয় দিব্য জ্ঞানের বিকাশ। দেবতা হয় এ দিব্য প্রকাশ। ব্রহ্ম উপাসনার গায়ত্রী ও প্রণব প্রধান ভিত্তি। প্রণব সংযুক্ত করে করতে হয় গায়ত্রীর উপাসনা।

মন্ত্র আনন্দের বিধৃতি জাগায়। মন্ত্রশাস্ত্রে যাঁরা কুশল তাঁরা এ জন্যেই মন্ত্রের বিভাগ অতি নিপুণভাবে করেন।

গায়ত্রীমন্ত্র অত্যন্ত গম্ভীর। এর ছন্দ বিকাশশীল, অন্তরকে ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিনিবেশ থেকে উন্মুক্ত করে বিরাট বোধে পূর্ণ করে। অন্তরকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও প্রসারিত করে।

এ গায়ত্রীমন্ত্রের এমনি ছন্দ যে অতিমাসানুভূতি সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়—বিশ্বচেতনা ও বিশ্বাতীত চেতনার সঙ্গে পরিচিত হই। মুক্তির কল্যাণস্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত করে এ মন্ত্র। তখন সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের সঞ্চার।

গায়ত্রীমন্ত্রের তিনটি বিভাগ। চেতনার সূক্ষ্ম লোকে, স্থূল লোকে ও অন্তঃজগতে প্রকাশকে অবলম্বন করে এ বিভাগ নির্ণয় করা হয়েছে। ব্রহ্মচেতনা সৃষ্টিতে সূক্ষ্ম লোকে প্রকাশিত, স্থূল লোকে প্রকাশিত, অন্তরেও প্রকাশিত। গায়ত্রীমন্ত্র এ প্রকাশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। অন্তশ্চেতনা, বহিশ্চেতনা ও সূক্ষ্মচেতনা সবই এক চেতনার বিকাশ—এটিরই স্মরণ ও বোধ করিয়ে দেয় গায়ত্রীমন্ত্র। গায়ত্রীমন্ত্র বিশ্বচেতনা (যার প্রতীক হল 'সবিতা') ও জীব-চেতনার ভেদকে অপসারিত করে দেয়। যখন অন্তরদীপ্তির ও বিশ্বদীপ্তির সম্বন্ধ হয়, তখন অন্তর হয় বিশ্ববিজ্ঞানে পূর্ণ। সে যুক্ত হয় বিশ্ব-ছন্দে। যে কল্যাণ মূর্তি সবিতৃ মণ্ডলের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত তার সঙ্গে হয় নিবিড় পরিচয়। অন্তরে

ও বাহিরে কল্যাণরূপকে অনুভব করি। তখন স্বচ্ছতায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন হয় পূর্ণ। বিশ্বের ও অন্তর সত্তার কল্যাণতম রূপে সাধকের তৃপ্তি। সূক্ষ্মচেতনার সঞ্চারে বিশ্বের অনুভূতি সুস্পষ্ট।

সপ্ত লোক

উপনিষদের সপ্ত লোকের কথা আছে,—ভু, ভুব, স্বঃ, মহ, জন, তপ, সত্য। এই লোকগুলিকে তাদের প্রকাশ ও স্বচ্ছতা অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক প্রথম বিভাগ। মহর্লোক দ্বিতীয় বিভাগ। জন, তপ ও সত্যলোক আর এক বিভাগ। শ্রীঅরবিন্দ এভাবে এ স্তরগুলির সম্বন্ধে একটি সুন্দর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এ লোকগুলির উর্ধ্ব, মধ্য, অধঃ বিভাগ আছে। উর্ধ্বতমলোক, সত্যলোক, তপলোক, জনলোক। সত্যলোকে সত্যের প্রকাশ। শুদ্ধ সন্মাত্র স্বরূপকে নিয়ে সত্যলোকের পূর্ণ বিকাশ। সত্যলোকে পরম সত্তা অখণ্ড ভাবে প্রকাশিত। এই সত্তা সকলের সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রতীত হয়। তপলোকে জ্ঞানশক্তির পূর্ণ প্রকাশ। এ লোকের আশ্রয় চিৎশক্তি। জনলোকে সত্যের আনন্দরূপের প্রকাশ, এই আনন্দ আনন্দঘন নয়, আনন্দের বিকাশ, আনন্দের মূর্ত রূপ। সচ্চিদানন্দ সত্তার, চেতনার ও আনন্দের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ সকল লোক তমিস্রার অতীত,—জ্ঞানময় ও আনন্দময়। নিম্নস্তরগুলি হচ্ছে ভূ, ভুব ও স্বর্লোক। এই তিনটি স্তর অন্ন,

O. P. 99—১৫

প্রাণ ও মনের স্তর। ভূলোকে ও ভুবলোকে প্রকৃতির স্থূল রূপের প্রকাশ। এ দুটি স্তর অন্ন ও প্রাণের ভূমি। তৃতীয় স্তরটি মনের ভূমি। তার ওপোরের ভূমি মহর্লোক। সেটি বিজ্ঞানের ভূমি। এই বিজ্ঞানলোক মানসলোকের অতীত। মানসলোকে আছে দুটি স্তর, একটি উর্ধ্ব, একটি অধঃ। অধঃ মানসলোকের সঙ্গে প্রাণের জগতের (vital world) খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উর্ধ্ব মানসলোকে জ্ঞান, সংজ্ঞা ও তাদের সম্বন্ধ স্ফূর্ত। চিন্তাজগতের (thought world) কার্য প্রণালী এখানে বিকশিত। বিজ্ঞানজগৎ (Idea world) এখান থেকে প্রসূত। এখানে আছে অতিমানসের অনুভূতি। এই অনুভূতি মানসলোকের স্তরে অবতরণ কখনও কখনও করে এবং তখন একটা উর্ধ্বস্তরের সংবেগ মানস জগতে স্ফূর্ত হয়—এই সব সংবেগগুলিকে সাধারণতঃ বলা হয় বেদবাণী। মানসস্তরে অবতরণ করলে বিজ্ঞানের নিজের অতিমানস রূপটির কিঞ্চিৎ লাঘবতা হয়। মানসস্তরে বোধ নানাবিধ মূর্তি নিলেও সেগুলি চিন্তার প্রকার রূপেই (concepts) থেকে যায়। বিজ্ঞানলোকে এই মূর্তিগুলি হয় প্রত্যক্ষ। তখন সে মূর্ত ও উদ্ভাসিত অতিমানস প্রজ্ঞালোকে। বিজ্ঞানলোকে সৃষ্টির সূক্ষ্ম ধারার সঙ্গে পরিচয়। তপঃ, জন, সত্যলোকের সঙ্গে স্থূল ও সূক্ষ্ম সৃষ্টির কোন সম্বন্ধ নেই। বিজ্ঞান-লোকের সঙ্গে উর্ধ্বলোকের ও অধঃলোকের সম্বন্ধ। এই বিজ্ঞানালোকের সত্য মূর্ত হয়ে ওঠে। তার রূপ ভাবমাত্র নয় (concept বা idea নয়), লীলায়িত, স্ফূর্ত (.spirit form)।

হৃদয়-গুহা থেকে ঊর্ধ্ব প্রসারিত পথ দিয়ে সাধক মহর্লোক ও তদূর্ধ্বলোকে করে প্রবেশ।

যোগের পথে সাধক অবস্থা থেকে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় এবং শেষ ভূমিতে সর্বশক্তিমত্তা প্রাপ্ত না হলেও সর্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়। তার দৃষ্টি কালকে অতিক্রম করে। তিনি ত্রিকালজ্ঞ হন। সিদ্ধভূমিতে কালের অনুভূতি থাকে না। কালই আমাদের জ্ঞানকে করেছে সীমাবদ্ধ। কালকে অতিক্রম করলে যুগপৎ বিশ্বের সব পদার্থের জ্ঞান হয়—এই জ্ঞান ঈশ্বরজ্ঞান, এজন্যেই বলা হয়েছে ঈশ্বরজ্ঞান অবাধিত। বস্তুর পরিণতি কালকে অবলম্বন করেই হয়। ঈশ্বরদৃষ্টিতে কাল সক্রিয় নয়, কালের ব্যবধান সে দৃষ্টিতে নেই, এ জন্যেই তিনি ত্রিকালজ্ঞ। যোগবিভূতি বা ঐশ্বর্য্য হচ্ছে স্থূলে কারণ বা সূক্ষ্মের বিকাশ। স্থূলের ভেতর সূক্ষ্মের বিকাশ বিস্ময় উৎপন্ন করে, কারণ স্থূল জগতের কার্য্য-প্রণালীর সঙ্গেই আমরা পরিচিত, স্থূলের অন্তরালে সূক্ষ্ম জগতের জ্ঞান আমাদের নেই। এজন্যে যোগবিভূতিকে অত্যাশ্চর্য বলে মনে হয়। বস্তুতঃ যাঁদের দৃষ্টি সূক্ষ্ম তাঁরা একে আশ্চার্য মনে করেন না।

মুক্ত পুরুষেরা এরূপ কালের অতীত হয়ে প্রকৃতির ওপোর কর্তৃত্ব করেন। তাঁরা প্রকৃতির পরিণতির নিয়ম ও প্রক্রিয়া সূক্ষ্মভাবে অনুভব করেন বলেই তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী প্রকৃতির পরিণতি। এই-ই মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য। এ কল্পনা নয়। মানুষ স্বভাবতঃ প্রকৃতির অধীন; প্রকৃতির ওপোর স্বাতন্ত্র্য

প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে সাধনার শেষ হয় না। প্রকৃতির কর্তৃত্বকে অতিক্রম করাই সাধনার উদ্দেশ্য—কি ব্রহ্মনির্বাণে, কি ঈশ্বরসাযুজ্যে প্রকৃতির অধিকারকে অতিক্রম করবার কথা সুস্পষ্ট। তাই মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য তার অতিমানবত্বেরই জ্ঞাপক।

যাঁরা মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্যকে গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁরা যোগদৃষ্টি-সম্পন্ন নন। আদর্শবাদের দিক দিয়ে অনেক কথা আছে, কিন্তু মানবীয় রূপের অতিক্রম হলে আদর্শ হবে না, এ দৃষ্টি বিচারসহ নয়। মানবত্বের সীমাকে অতিক্রম করে ঈশ্বরীয় শক্তি ও জ্ঞান লাভ করাই লক্ষ্য। মুক্ত পুরুষেরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও ঈশ্বর শক্তির সাথ ঐক্য অনুভব করেন। এ জন্যেই তাঁদের শক্তি অনেক সময়েই দুর্বোধ্য। সাধনায় সত্তাতিশয্যের স্বচ্ছতায় মানুষের স্বাভাবিক সংকীর্ণতা হতে মুক্তি। তখনি ঐশী শক্তির আবির্ভাব।

মুক্তি ও ঈশ্বর

উপনিষদে তপস্যা ও শ্রদ্ধার কথা আছে। তপস্যা ও শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হয়ে, মুমুক্ষুরা অরণ্যে বাস করেন এবং যোগে সেখানে গমন করেন যেখানে অমৃত অব্যয় আত্মার বিরাজ। আরো বলা হয়েছে যাদের দেবে ও গুরুতে পরাভক্তি আছে তাদের জন্যই এই পথ। ভক্তি শুধু দিব্য বুদ্ধিই দেয় না, আকর্ষণ করে দেবপ্রসাদ। এই দেবপ্রসাদই দেয় জ্ঞান।

দেবপ্রসাদ হলে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। এই যোগ-সূত্রকে অবলম্বন করে কেউ কেউ ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। কেউ বা ঈশ্বর থেকে পরা বিজ্ঞান লাভ করে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

ঈশ্বরের ভেতর মানুষকে মুক্ত করবার স্পৃহা আছে। এ তাঁর জীবের প্রতি প্রেম। জীবকে তিনি বরণ করে নেন তাঁর প্রেমের দ্বারা। ঈশ্বরের জ্ঞান, ঐশ্বর্য, প্রেম ও শক্তি কিছুরই অভাব নেই। ঈশ্বরের প্রেমকেই যাঁরা মুক্তির কারণ বলে মনে করে তাঁতে আকৃষ্ট হন, তাঁরা ঈশ্বরের একাংশই দেখেন, তার পূর্ণ বিরাট স্বরূপের আর কিছুই অনুভব করতে পারেন না। মুক্তির জন্যে প্রেম অবশ্যম্ভাবী হতে পারে কিন্তু মুক্তির উর্ধ্বভূমিকায় যে জ্ঞানের উদারতা, শক্তির বিশালতা ও আনন্দের উদ্বেলতা আছে তাকে জানতে না পারলে ঈশ্বরের সম্যক্ পরিচয় হয় না। বিশুদ্ধ অন্তরে এই ধারণা হয়। ঈশ্বর-কৃপা জ্ঞানের পরিপন্থিগুলিকে সরিয়ে কল্যাণে প্রতিষ্ঠা করে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ও কৌষিতকী উপনিষদে মুক্তির জন্যে ঈশ্বর কৃপার কথা আছে। তাঁর অভিধ্যান দেয় চিত্তশুদ্ধি. শুদ্ধচিত্তে তিনি প্রকাশ করেন অনন্ত শক্তি, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠতম দান হচ্ছে জ্ঞানের চরম বিকাশ।

জীবন্মুক্ত

সবচেয়ে বড় আশার কথা হচ্ছে এই, ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান এ জীবনেই লাভ করা যায়, এ আশ্বাস শ্রুতি থেকে পাই।

জীবন্মুক্তি বলতে গেলে মুক্তির উদার তৃপ্তি ও অতুলনীয় শান্তিকে জীবনে অনুভব করাই বুঝি। জীবন সাধারণতঃ বেদনা, বিজ্ঞান ও আনন্দের ভেতর দিয়ে সঞ্চারিত হয়। জীবন্মুক্তের এ-সবের সঞ্চার নেই। তার বোধ ব্রহ্মবিজ্ঞানে বিকশিত, আনন্দ অপরিসীম সত্তায় মগ্ন, তিনি সর্বকালেই ব্রহ্মসম্পন্ন, শুধু ব্রহ্মসম্পন্ন নন ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন।

জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশে উপাধির লয়, অখণ্ডচেতনার স্ফুরণ। এ অখণ্ডচেতনার বোধেই মুক্তি। ব্রহ্মনির্বাণ শুধু সঙ্কোচশীল বৃত্তি হতে মুক্তি নয়, শুধু বৃত্তির প্রসার নয়। স্থিররূপে চেতনার অখণ্ডত্বের প্রতীতি। এই প্রতীতিতে উপাধির লয়। উপাধির ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হলেও সহসা উপাধি বিদীর্ণ হয় না। উপাধি কর্মপ্রসূত। কর্মবীজ প্রজ্বলিত জ্ঞানে ধ্বংস হলেও যে সংস্কারে বর্তমান শরীর ধারণ, ভোগ ভিন্ন তা ক্ষয় হয় না। সেই জন্য জ্ঞানীর শরীরের অনুবৃত্তি হয়, জাগ্রতের উত্থান হয়। কিন্তু পূর্ববৎ আমিত্ববোধের সঞ্চার চিরতরে স্তিমিত হয়।

জ্ঞানের বিকাশ হলেই ব্যবহার সর্বত্র সমান হয় না। ব্যবহার নিয়মিত হয় পূর্বসংস্কারের দ্বারা। পূর্ব্বসংস্কারগুলি জীবন্মুক্তের জীবনেও ক্রিয়াশীল হয়, যদিও সে সংস্কার ভেতরে কোন উল্লাস বা অবসাদ সঞ্চার করে না। জ্ঞান প্রতিষ্ঠা হলেও জ্ঞানের এমন শক্তি নেই যে সমস্ত সংস্কারকে উন্মুলিত করে এবং প্রারব্ধ ভোগের ক্ষয় করে। এ জন্যেই জীবন্মুক্তের নানারূপ ব্যবহার দেখা যায় যদিও তার অন্তর জ্ঞানে পূর্ণ ও আনন্দে

সমাহিত। তার চেতনার বিলয় কখনও হয় না; সক্রিয় হলেও সে শান্ত। চিত্তের নিরোধ বা বিক্ষেপ জীবন্মুক্ত পুরুষের জীবনে থাকে না। তাঁর চিত্তনিরোধও নেই, চিত্ত-বিক্ষেপও নেই। তিনি মুক্ত। জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা সহজভাবেই চিত্তের ওপোর ক্রিয়া করে। চিত্তে আসে শান্তি, প্রাণে আসে ধৃতি, কিন্তু জ্ঞানী উদাসীন চেতনায় নিমগ্ন।

উপনিষদে জ্ঞানীর শ্রেণীবিভাগ আছে: ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মবিৎবর, ব্রহ্মবিৎবরীয়ান, ব্রহ্মবিৎবরিষ্ঠ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, এ শ্রেণী-বিভাগ যথার্থ নয়—জ্ঞানীর কোনও শ্রেণী নেই। জ্ঞান সত্যপ্রতিষ্ঠা, তা সর্বত্রই সমান। কিন্তু জীবনের গতির সঙ্গে সত্যপ্রতিষ্ঠার একটি সম্বন্ধ আছে, ধ্যানের শান্তির ভেতর যে গভীর জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে পূর্ণরূপে ধারণ করতে হলে সত্যের কেবল অনুভূতিই যথেষ্ট নয়, তাকে এমন দৃঢ় করতে হয় যে জীবনের অঙ্গীকরণে তা হয়ে উঠবে অভিন্ন। এরই তারতম্যের অনুযায়ী জীবন্মুক্তের স্তরবিভাগ।

জ্ঞান ও যোগ

যোগ দেয় ঈশ্বরসান্নিধ্য, জ্ঞান দেয় ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু যোগ অর্থে যদি বুঝি মানুষের- সহজ বৃত্তিগুলিকে নিয়মিত করা, তাকে বিশেষভাবে কার্যকরী করে সুখের পথ অধিকার করা, তাহলে অত্যন্ত ভুল বোঝা হবে। যোগ-পথে অনেক সিদ্ধি আসতে পারে, কিন্তু উপনিষদের যোগের লক্ষ্য এমন কিছু

নয়। মানুষকে জ্ঞানের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই যোগের আবশ্যকতা। এবং এর শেষ পরিণতি সেখানেই। যোগ যে জ্ঞান দেয় তা দিব্য—মানবীয় বৃত্তিগুলিকে দূরীভূত করে সে ভাগবতী বৃত্তি স্থাপিত করে। এইজন্যেই এ পথে যে জ্ঞান উদ্‌ভাসিত হয় তা প্রকৃতির স্বরূপের সন্ধান দেয় এবং তার তুচ্ছ স্বরূপের সন্ধান পেয়েই যোগমার্গে সাধক অগ্রসর হয় প্রকৃতির অতীত ঈশ্বর উপলব্ধির দিকে। যোগ দেয় মহিমা, জ্ঞান দেয় অভয়।

ব্রহ্ম-নির্বাণ

মুখ্য মুক্তিমার্গে যাঁরা বিচরণ করেন, তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে অদ্বৈত জ্ঞানের পর ব্রহ্মনির্বাণ। তাঁদের কাছে ঐশ্বর্য ও মহিমা প্রতিভাত হলেও তাঁরা সে বিষয়ে উদাসীন। যদি কিছুতে তাঁরা নিযুক্ত হন তো তার উদ্দেশ্য প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয়—কিংবা অধিকারিক পুরুষের বেলায়, কোন বিশ্বকল্যাণ সাধন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁদের কোন ইচ্ছে থাকে না; স্বতই হতে থাকে। জ্ঞান প্রতিষ্ঠার পর কর্মের কোন অবসর নেই—বিশেষতঃ যাঁরা নির্বিশেষ জ্ঞানকেই জীবনের ভিত্তি করেন। কিন্তু যোগমার্গে মুক্ত পুরুষ প্রকৃতির সব স্তরে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারেন; তাঁর সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে হৃদয়াভ্যন্তর হতে প্রসৃত হয়ে যে জ্যোতিধারা সমস্ত সূক্ষ্ম জগৎ প্রকাশ করে সেই ধারাকে অবলম্বন করে হিরণ্যগর্ভ লোককে ভেদ করে ব্রহ্মসন্নিধি লাভ করা, এবং স্বেচ্ছায় এই

মার্গে গমন করা। এই পথের আবরণ উন্মুক্ত হলে সাধকের "ভূ'লোক" হতে "ব্রহ্মলোক" পর্যন্ত জ্ঞান হয় এবং সাধক ক্রমশঃ উচ্চতর লোকের গতিধারা ও শক্তিধারার সঙ্গে পরিচিত হন। তখন তাঁর মানসলোকের অস্পষ্টভাব দূরীভূত হয়, কোন সংকল্প বিকল্প থাকে না। তাঁর সমস্ত সত্তা তখন আলোড়িত হয় ব্রহ্ম শক্তিতে।

আত্মপ্রতিষ্ঠা ঔপনিষদ সাধনার চরম লক্ষ্য। অন্তঃহৃদয়ে আত্মা পৃথিবীর চেয়ে বড়, অন্তরীক্ষের চেয়ে বড়, দিব্য দ্যোতনশীল জগতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ সর্বলোকের চেয়ে। এই আত্মাকে জানতে পারলে মানুষ সর্বগ্রন্থি হতে মুক্ত হয়। আত্মস্মৃতি জাগরিত হলে অন্তরের সকল গ্রন্থি—যাদের অবলম্বন ক'রেই ব্যক্তিত্ব,—ছিন্ন হয়, মানুষ মুক্তির পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এ জন্যেই মুখ্য মুক্তিমার্গে মুক্ত পুরুষের নিষ্ক্রমণের কথা বলা হয় নি। কারণ মুক্তপুরুষের কোথায় নিষ্ক্রমণ হবে—তার সত্তা যে ব্রহ্মসত্তা।

মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য ও গতি

মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্যের কথা শ্রুতিতে আছে। মুক্তপুরুষের ইচ্ছা অপ্রতিহত। তিনি কামনা করলেই সে কামনা সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি সকল সম্পদকে তাঁর কাছে প্রকাশিত করে—পিতৃলোক, দেবলোক প্রকাশিত হয়। মুক্তপুরুষের জ্ঞান অপ্রতিহত। কখনও কখনও মুক্তপুরুষ ঈশ্বরের মত শক্তি

O. P. 99—১৬

লাভ করেন। মুখ্য মুক্তির পথে এরূপ শক্তি ও ঐশ্বর্য না থাকতে পারে, কারণ এই তার লক্ষ্য নয়। এ ঐশ্বর্য উপাসনার ফল, গৌণ মুক্তির পথে অবশ্যম্ভাবী বিকাশ। মুখ্য মুক্তিমার্গে এরূপ বিকাশ অসম্ভব নয়, কিন্তু সাধক সে দিকে আকৃষ্ট হন না। তাঁর গতিকে তিনি রুদ্ধ করেন না। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সমস্ত বিভূতির অতীত ব্রাহ্মীস্থিতির দিকে। গৌণ মুক্তিমার্গে সাধক নানাবিধ বিভূতিসম্পন্ন হলেও জগৎ ব্যাপারের ওপোর তাঁর কোন কর্তৃত্ব থাকে না। প্রকৃতির নানা স্তরের জ্ঞানসম্পন্ন হয়েও বিশ্বধারার কোন পরিবর্তন তিনি করতে পারেন না। তার ওপোর তাঁর কোন অধিকার নেই। সে অধিকার ঈশ্বরের। জ্ঞানের উচ্চস্তরে উঠলে সাধক জানতে পারেন বিশ্বব্যাপার এমনি কৌশলে নিয়মিত যে এতে হস্তক্ষেপ করবার কিছুই নেই। সংকীর্ণ দৃষ্টিতে জগৎ ব্যাপারে যে সব বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্য দেখতে পাওয়া যায় গভীর দৃষ্টিতে তাদের একটি সামঞ্জস্য উপলব্ধ হয়। জ্ঞানের সীমা যত বেড়ে ওঠে, ততই সব বৈষম্যে স্বরূপকে বুঝে সৃষ্টির কৌশলে আশ্চর্য হই। বিরাট দৃষ্টিতে সকল বৈষম্য দূর হয়।

যোগপ্রতিষ্ঠা বুদ্ধিকে এরূপ দৃষ্টি দেয়। এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে চিত্ত বিশ্রান্তি লাভ করে। যোগদৃষ্টিও জ্ঞানদৃষ্টির ভেতরে যেটুকু শক্তির কথা আছে তাও ক্রিয়াশীল হয় বিশ্ব-বিধানকে অবলম্বন করেই। মানুষের অসীম শক্তি হলেও তার একটা সীমা আছে। এবং সে সীমা এই যে জগৎ ব্যাপারের ওপোর তার কোন কর্তৃত্ব থাকে না।

যাঁরা উপাসনামার্গে বিচরণ করেন এবং দিব্যজ্ঞানে ও শক্তিতে অনুপ্রাণিত হন তাঁদের হয় উর্ধ্বগতি। তাঁদের মলিন সংস্কার বিলীন হয়। তাঁরা দিব্যসংস্কার প্রাপ্ত হন এবং তদনুযায়ী হয় তাঁদের শক্তি। উপাসনার দ্বারা চিত্ত দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হয় এবং উর্ধ্বলোকের দিব্যসঞ্চার হয়। শুধু তাই নয়, একটি সূক্ষ্ম আলোকধারাকে অবলম্বন করে, তাঁরা উর্ধ্বলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করেন। উপনিষদের ভাষায় তাঁরা দেবযানমার্গে গমন করেন। এই উর্ধ্বলোক জ্যোতির্ময়, শুভ্র। এই পথকে অবলম্বন করে তাঁরা ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত হন।

এ পথে যাঁরা বিচরণ করেন তাঁদের অন্তরীক্ষলোক ও তদুপরি লোকের জ্ঞান হয়। এ লোকগুলিতে জীবনসংবেগ ধীর ও শান্ত, জ্ঞান উদার, প্রাণ ছন্দময়, বিজ্ঞান অব্যাহত। এ জন্যেই একে দিব্যমার্গ বলা হয়; দেহাবসানে এই মার্গে বিচরণশীল পুরুষের উর্ধ্বাম্নায়ে গতি হয়। উর্ধ্বলোকে অবস্থিত অমানবক পুরুষের দ্বারা আদৃত ও নীত হন, কৌষিতকী উপনিষদে এই কথা আছে। যতই সাধক উর্ধ্বলোকে বিচরণ করতে থাকেন, তিনি ততই দিব্যতেজঃসম্পন্ন হন, অশরীরী দিব্যপুরুষের সঙ্গ প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই তাঁর গতির শেষ নয়। তাঁর গতির শেষ হয় ব্রহ্মলোকে। এই ব্রহ্মলোক হতে সাধকের আর পুনরাবৃত্তি (পুনরাগমন) হয় না। এই মার্গে বিচরণশীল সাধক হিরণ্ময় কোষে প্রবেশ করেন, এবং সে কোষ ভেদ করে ব্রহ্মলাভ করেন।

মুক্তির সম্বন্ধে দুটী ধারণা উপনিষদে সুস্পষ্ট—একটি ব্রহ্মনির্বাণ, আর একটি ব্রহ্মসাযুজ্য। প্রথমটি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশে সুস্পষ্ট; দ্বিতীয়টি কৌষিতকী ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্যে বিশেষতঃ দহরবিদ্যার শেষ দিকে সুস্পষ্ট। এদের ভেতর তেমন কোন বিরোধ নেই। ঈশ্বরকৃপা অপ্রতিহত জ্ঞান, অপরিমেয় সত্তার সন্ধানের পথ খুলে দেয়। অবস্থাবিশেষে দুটিতে দুরকম অভিজ্ঞতা; কিন্তু দ্বিতীয়টি হতে প্রথমটিতে উপনীত হওয়া যায়।

একথা নিঃসন্দেহ যে সাধকের যোগমার্গে ও উপাসনামার্গে—ঈশ্বরের দিকে গতি হয় এবং উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বতর লোকের ভেতর দিয়ে তিনি ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ করেন।

পর্যাঙ্কবিদ্যার নির্ণয় করিতে গিয়ে একথা বলা হয়েছে। যাঁরা সগুণ ব্রহ্মবিদ্যাতে কুশল, তাঁদের গতির পথে চন্দ্রলোক, বিদ্যুৎলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোকের দর্শন হয়; পরিশেষে তাঁরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন।

এই লোকগুলি সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট নয়। তবে চেতনার সূক্ষ্ম বোধের সঙ্গে এরূপ স্তরের অনুভূতি। এ সব স্তর জ্যোতিতে, শক্তিতে, প্রশান্তিতে পূর্ণ। এরা অতিমানসের স্তরবিশেষ এবং এ সব বোধে অস্তিত্বের সূক্ষ্ম স্তরগুলি প্রকাশিত। উর্ধ্ব মানস চেতনায় এসব লোকে অমানব পুরুষের সাক্ষাৎকার। তারা আরও উচ্চতর স্তরে সাধককে

চালিত করে। চিতি-পুরুষের (psychic self) ক্রিয়াশীলতায় এ সব লোকগুলির পরিচয়।

এই চৈত্য পুরুষের জাগরণের সঙ্গে সূক্ষ্ম জগতের নানা স্তরে প্রকাশ। এ স্তরগুলির কথা সংক্ষেপে উপনিষদে বলা হয়েছে। চৈত্যপুরুষের সঙ্গে বিরাটপুরুষের (cosmic self) একটি সম্বন্ধ (correspondence) আছে। চৈত্যপুরুষের অনুভূতির গভীরতায় লোকবিশেষের প্রকাশ। এই লোকবিশেষের সূক্ষ্মতা অনুযায়ী নানারূপ অনুভূতি। তবে এই মার্গে তেজ, স্বচ্ছতা, প্রকাশ, স্ফূর্তির সঞ্চার। শুধু তাই নয়—অন্তঃসত্তাও ক্রমশঃ প্রকাশশীল ও আবরণমুক্ত হয় এবং এ সব লোকের স্পন্দনকে অনুভব করে। সূক্ষ্ম বেদনার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব সূক্ষ্ম লোকের অনুভূতি জাগে। কিন্তু দেবযানমার্গেও সাধন এইরূপ জ্ঞান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তাদের এ সব স্তরগুলি অতিক্রম করে যেতে হয়। সাধকের আবশ্যক হয় সচেতন থাকা। চেতনার সঞ্চার ঠিক থাকলে সাধকের অন্তঃপ্রেরণা তাকে ঊর্ধ্বদিকেই নিয়ে যায়, যতক্ষণ না তার ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়, তার আস্পৃহা ও সত্তার অস্ফুট বেদনাই তাকে চরম ঈশ্বরানুভূতির দিকে অগ্রসর করিয়ে দেয়। ভূমাতেই সাধকের তৃপ্তি, অন্তরের এই ভূমার আস্পৃহাই ঈশ্বরসাযুজ্য দিয়ে দেয়। জীব ঈশ্বরে লীন না হয়ে তার অঙ্গরূপে, তার জ্ঞান, আনন্দ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়।

এই মার্গও সূক্ষ্ম প্রাণের মার্গ। সূক্ষ্ম প্রাণকে গ্রহণ করে সাধক

এরূপ বিকাশের অধিকারী। এ মার্গে কোথাও লয়ের কথার উল্লেখ নেই। এ মার্গে ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার অভেদ ভাবনা থাকলেও সেই ভাবনা পূর্ণ অভিন্নত্বের ভাবনা নয় বলে এ মার্গে সাধক ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হয় না। তার জ্ঞান ও সত্তা অসীম ও উদার স্বরূপকে অনুভব করলেও, বিকাশ বিশ্বময় হলেও, পূর্ণরূপে নিস্তরঙ্গ নয়। জ্ঞান স্বচ্ছ, আবরণ শূন্য। বিশ্বসত্তা, বিশ্বাতীতসত্তা এই জ্ঞানে উদ্‌ভাসিত। এখানে কল্লোল আছে, কিন্তু তা শান্তিপূর্ণ; জ্ঞান আছে, কিন্তু সতত প্রকাশশীল; জীবন আছে, কিন্তু নেই স্তব্ধতা। ছন্দ আছে, অনাহত সঙ্গীত আছে, মৌন নীরবতা নেই। প্রাণে উদ্বেলিত, বিজ্ঞানে উদ্‌ভাসিত, ছন্দে মুখরিত, আনন্দে লীলায়িত জীবনই এরূপ স্তরে প্রকাশিত। কিন্তু জীবনের সকল সঙ্গীতধারা যে অপরিমেয় শান্তির ভেতর নীরব হয়ে যায়, সে মৌন উল্লাসহীন স্তব্ধতা, সে অসঙ্গ আত্মার পরিচয় এখানে হয় না। এখানেই সাধক সকল গ্রন্থি হতে মুক্ত হয়। জীবত্বের পরিধি যতই প্রসারিত হোক না কেন তার স্বরূপকে অপসারিত করতে না পারলে তার ক্ষুদ্রতার পূর্ণ বিস্মৃতি হয় না। এ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পৃথক অনুভূতি দেয়, এ সময় মানুষ চিত্তের সকল সংবেদন ও বেগ হতে পায় পূর্ণ বিশ্রান্তি। বিশ্বের সকল স্মৃতি হতে বিচ্যুতিই মুক্তি, স্মৃতি জীবন-ধারাকেই অবলম্বন করে থাকে, স্মৃতি অপগত হ'লে মুখর জীবনও স্তব্ধ হয়। জীবন-সঙ্গীতের মধ্যে আছে স্তব্ধতা, এই স্তব্ধতাকে অবলম্বন ক'রে অনাহত সঙ্গীতের ছন্দ প্রতিষ্ঠিত। গৌণ মুক্তিমার্গে জ্ঞানের পরিধি ক্রমশঃই বিস্তৃত হয়। ক্রমঊর্ধ্বলোকের জ্ঞান নিম্ন-

ভূমিকার জ্ঞানকে রূপান্তরিত করে। এই সব লোকের ভেতর সম্বন্ধসূত্র আছে। নিম্নকার ভূমিকা উর্ধ্বভূমিকার শক্তিদ্বারা সঞ্চারিত। এ ভাবে সত্তা ও জ্ঞান রূপান্তরিত ক'রে উর্ধ্বপথে আরোহণ করতে পারি।

এই যে স্তর বিভাগ এও জ্ঞানের অবস্থা বিশেষ, এ অবস্থাগুলি আমাদের রূপান্তরিত জ্ঞানের প্রকাশ। যাঁরা এই দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁরা ব্রহ্মকে সমস্ত বিশ্বেই ওতপ্রোত ভাবে দেখেন, কারণ সমস্ত সত্তাই যে ব্রহ্মরূপ। কিন্তু ব্রহ্মদৃষ্টি মূল লক্ষ্য, এবং সে দৃষ্টি খুলে গেলে সর্বত্র ব্রহ্মানুভূতি হয়।

কৌষিতকী উপনিষদে দেবযানমার্গে বিচরণশীল পুরুষের আহ্বানের একটি সুন্দর চিত্র আছে। ঈশ্বর দিব্যশক্তিগুলিকে দেবযানমার্গের সাধকদের যোগ্য সম্মান দিতে বলেন। তাঁরা এরূপ মুক্তপুরুষের কাছে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরূপ আহূত হয়ে ব্রহ্মলোকাভিমুখে অগ্রসর হন। তাতে যথাক্রমে "ব্রহ্মশব্দ", "ব্রহ্মরস", "ব্রহ্মরস", "ব্রহ্মতেজ", "ব্রহ্মযশঃ" প্রবেশ করে।

রূপক ভাবে এখানে গভীর অনুভূতির কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতির অতীত হয়ে মুক্তপুরুষের চৈতন্য যখন অধঃপ্রকৃতির সীমা অতিক্রম করে, তখন তার দিব্যস্বচ্ছতা, দিব্যানন্দ, দিব্যতেজ প্রাপ্তি হয়। চেতনার এরূপ বিকাশ মুক্তাত্মার দিব্য স্বরূপের বিকাশ। তার অনুভূতি সকলই দিব্য।

সন্ন্যাস যোগ

উপনিষদগুলি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হবে যে ব্রহ্মসাধনা, ব্রহ্মবিচার সকল আশ্রমেই হতে পারে। শিষ্য ব্রহ্মবিদ্যার জন্যে গুরুর কাছে সমাসীন হতেন। এমন কি পুত্রও পিতাকে গুরুর স্থানে বরণ করে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতো। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যে রকম ব্রহ্মবিচার করতেন, গৃহস্থাশ্রমীও করতেন সেই রকম বিচার। জাতিধর্ম ও আশ্রমধর্ম নির্বিশেষে ব্রহ্মবিদ্যা নিষ্পন্ন হ'ত।

ব্রহ্মবিদ্যার কারণ অধ্যাত্মযোগ। সে আশ্রম ধর্মকে অপেক্ষা করে না, অপেক্ষা করে জ্ঞানকে। জ্ঞানের প্রধান কারণ সুদৃঢ় ভাবনা, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ও সম্যক্ দৃষ্টি। তার সঙ্গে আশ্রম ধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই। শুদ্ধ সংযত পুরুষেরাই জ্ঞানের অধিকারী। জ্ঞানের আর কোন বিশেষ কারণ নেই। একাগ্রবৃত্তি, যোগ ও ধ্যান জ্ঞান লাভের সহায়ক।

উপনিষদে অনেক গৃহস্থাশ্রমী জ্ঞানীর উল্লেখ আছে। জনক, যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য ঋষিরা গৃহধর্মানুষ্ঠান করতেন। সন্ন্যাসের কথা উপনিষদে কমই আছে। জ্ঞান বাইরের অবস্থাকে আশ্রয় করে থাকে না, আশ্রয় করে না আশ্রম ধর্ম, সংস্থিতির ব্যবস্থা। জ্ঞান তত্ত্বের বিকাশ। একথা স্বীকার করতে হবে যে বাইরের অবস্থা অনুকূলরূপে বা প্রতিকূলরূপে জ্ঞান সঞ্চয়ে সাহায্য করে বা বাধা জন্মায়। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করবার জন্যে অন্তঃকরণের বিষয়াকর্ষণ হতে বিমুক্তি আবশ্যক। বিষয়রত

চিত্তে জ্ঞানের নির্মল বিকাশ হয় না। আশ্রম বিশেষে এই আকর্ষণ বেশী বা কম। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে বা বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস আশ্রমে জ্ঞানের বাধা খুব কম। ব্রহ্মচর্য রক্ষাদ্বারা ওজঃ শক্তির বৃদ্ধি হয়, চিত্তের ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। হৃদয়গুহায়প্রবিষ্ট সাধক ব্রহ্মধ্যানের অধিকারী। ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। এতে শরীর, মন, প্রাণ সবই দৃঢ় হয়। তাদের ভেতর আসে সমতা। সমতাই দেয় উচ্চতর ধ্যান ও জ্ঞানের অধিকার। এ জন্যই উপনিষদে এর এত প্রশংসা। ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠার ভেতর থাকে ব্রহ্মজ্ঞানের আস্পৃহা। আস্পৃহা দেয় প্রেরণা।

ব্রহ্মচর্য জীবনকে পরিচালন করবার একটা কৌশল। এ মনের সঙ্গতিসম্পন্ন ভাবনা, প্রাণের ছন্দোময় গতি, শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য। এতে সূক্ষ্ম বুদ্ধির জাগরণ হয়। জীবনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে পারলে এর সুন্দর বিকাশ ও পরিণতি দেখা যায়। এজন্যেই ব্রহ্মে চরণ করার কথা পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই ব্রহ্মে চরণ জীবনের উচ্চতম কলা ও কৌশল। এ দেয় বুদ্ধির উন্মেষ, অন্তরের বিকাশ, ছন্দোবদ্ধ জীবনের পরম সুখ ও শান্তি। জীবনে ছন্দের একবার প্রতিষ্ঠা হলে, তা আর নষ্ট হয় না।

গৃহস্থাশ্রমে এই ছন্দোময় জীবনের আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী, এখানে হৃদয়ে হৃদয়ে ছন্দের ক্রীড়া হ'তে থাকে। একটি ছন্দ মূর্ত হয় নানা ব্যক্তির ভেতর দিয়ে। এ আশ্রমে ছন্দ

O. P ৭৭—১৭

লাভ করতে পারে না একটা সহজ গতি—কারণ তা অবরুদ্ধ থাকে প্রাণস্তরের কোন আকর্ষণে। বিজ্ঞানের ছন্দে অধিরোহণ কর্‌লেও প্রাণের আকর্ষণ থেকে নির্মুক্ত হয় না। তাই গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন অন্যান্য আশ্রমের কথাও বলা হয়েছে। সেখানে প্রাণের কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ নেই। প্রাণের ছন্দ বিজ্ঞানের ছন্দে পূর্ণ। বিরাট জীবনের স্পন্দন, আনন্দ ও আকর্ষণ এখানেই। প্রাণ তার চেষ্টাকে এই বৃহত্তর জীবনের আস্বাদ দেয়। প্রাণের চেষ্টার চেয়ে প্রাণের আরাম আরও বেশী সুখপ্রদ। প্রাণায়াম দেয় এই বিশ্রান্তি। যদি বিষয় ভোগের আকর্ষণ প্রাণে থাকে তবে প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠা হয় না। বিষয় ভোগ হতে উপরত হলে প্রাণে পায় উচ্চ শক্তি; সে শক্তিই দেয় ব্রহ্মবিজ্ঞানের অধিকার। সন্ন্যাসে ও বানপ্রস্থে প্রাণের বিতৃষ্ণা থেকে বিমুক্তি। সন্ন্যাস আশ্রমে জীবনের গতি স্বাধীন, উন্মুক্ত। সকল আকর্ষণ মুক্ত হয়ে চেতনার বিরাট অবকাশের ভেতর প্রাণের স্বচ্ছন্দে বিচরণ। তখন উন্মুক্ত চেতনার সঙ্গে প্রাণের ছন্দের মিল। জড়তা, চাঞ্চল্য রহিত হয়ে প্রাণ স্ফুর্ত হয় এক সহজ গতিতে। ক্ষুদ্র আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ায় এর ভেতর সঞ্চারিত হয় বিশ্ব-আকর্ষণ ও বিশ্বগতি। জ্ঞান কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সকল বিশ্বে আত্মারই প্রকাশ দেখে। প্রাণ, মন হয় বিরাটের ছন্দে পূর্ণ, অনুভূতির গভীর স্তরে নিমগ্ন। আশা আকাঙ্ক্ষার অভিসন্ধানে এরূপ চিত্ত স্বাচ্ছন্দ্য হয় না। জ্ঞান স্বাচ্ছন্দ্য ও অভয়। সন্ন্যাসযোগে এই স্বাচ্ছন্দ্যের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। বিরাট জীবনের ছন্দ এরূপ স্বাচ্ছন্দ্যেই প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু এর মুখ্য ফল আত্ম-প্রতিষ্ঠা, নিরন্তর আত্ম-স্মৃতি ; স্বাভাবিক জীবনের কিঞ্চিৎ আকর্ষণ থাকলেও এই স্মৃতি সম্ভব হয় না। সাধারণ জীবনের বিস্মৃতি হতে হয় এই স্মৃতির সঞ্চার। আত্ম-স্মৃতির জন্যেই সন্ন্যাস আবশ্যক। যাজ্ঞবল্ক্য এই আত্মজ্ঞানে পূর্ণপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা হলেই সংসারের বোধ নষ্ট হয়ে যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে :—"এই আত্মাকে জেনে ব্রাহ্মণেরা পুত্র, বিত্ত, ধনের স্পৃহা হতে মুক্ত হয়ে ভিক্ষাচর্যা গ্রহণ করেন। মানুষের এষণার ভেতর এই তিনটিই প্রধান। এদের মূলে আছে জীবত্বের আকর্ষণ, এ আকর্ষণ হতে মুক্ত হবার জন্যে সন্ন্যাসযোগের ব্যবস্থা হয়েছে।"

সন্ন্যাস দু রকম হতে পারে। জ্ঞান লাভের জন্যে সন্ন্যাস, পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে সন্ন্যাস। প্রথমটিকে বলা হয় বিবিদিষা-সন্ন্যাস, দ্বিতীয়টিকে বলা হয় বিদ্বৎ-সন্ন্যাস।

বিবিদিষা-সন্ন্যাসের মূলে আছে ব্রহ্মবিজ্ঞানের আস্পৃহা, বিদ্বৎ-সন্ন্যাসের মূলে আছে ব্রাহ্মীস্থিতির আস্পৃহা। জ্ঞান লাভ হলেও জ্ঞানের স্থিতির জন্যে আবশ্যক হয় কর্মবিরতি। জ্ঞানকে দৃঢ় করতে হলে জীবনের সকল বেগ এমন কি সকল ছন্দেরও অবসান করা দরকার।

জ্ঞান মৌন প্রতিষ্ঠা। এ জন্যেই অন্তরের সকল গ্রন্থির

উন্মোচনের প্রয়োজন। বিদ্বৎ-সন্ন্যাস এই অধিকার দেয়। জীবনের স্বাধীন গতিও এখানে শান্ত। যেখানে জীবনের সকল ছন্দের বিরাম জ্ঞানী সেখানে জাগ্রত।

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

বর্তমান সময়ে সভ্যতার দৃষ্টি ও লক্ষ্য নিরূপণ করা কঠিন। নানা ভাবধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি। দার্শনিকেরা অভিব্যক্তির ধারার সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে বিরাট বোধের সন্ধান পাচ্ছেন। সৃষ্টি অগ্রসর হচ্ছে একটা সমষ্টি চেতনার দিকে, যার ফলে সত্য, সুন্দর, শিবের বিকাশ হবে। অভিব্যক্তি ধারার ঊর্ধ্বগতিতে সৃষ্টি এখন উচ্চতর স্তরে উপনীত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু বলেছেন সৃষ্টি ধ্বংসের পথেই যাচ্ছে। সৌরলোকের নাকি এমন কিছু পরিবর্তন হচ্ছে যার জন্যে বিশ্বধ্বংসের আশঙ্কা আছে। অন্যদিকে কবির দৃষ্টি মানবত্বের অভিনব মূর্তি দেখতে পেয়েছে, সে গাইছে মানবের জয়গান।

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি বা দার্শনিকের দৃষ্টিতে বিশ্বের গতির রূপ যাই হোক না কেন, বর্তমান সভ্যতার প্রধান কথা হচ্ছে মানবের অধিকারের কথা। সকল দেশেই মানব সমাজ-সংস্থিতির পরিবর্তন চলছে। মানুষ তাকে বুঝতে চাচ্ছে মানুষের অধিকার নিয়ে। শুধু জ্ঞানের কথাতেই সে পরিতৃপ্ত নয়, সে চাইছে এমন কোন প্রাপ্তিকে যা তাকে শুধু একটা কল্প-লোকের আদর্শ দিয়ে তৃপ্ত করবে না, তাকে মণ্ডিত করবে মানবত্বের পূর্ণ মহিমায়। মানুষ অলীক নয়, সে এখানে চায়

সব প্রাপ্তিকে। আজ সে চাইছে তাকে বুঝতে, তার শত দুর্বলতা, কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে শুভ্র ও অখণ্ড মানবত্ব লাভ করতে। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" এই হয়েছে আজ সভ্যতার কথা। এই কথাটি আজ রূপ নিচ্ছে শুধু সমাজে নয়, দর্শনেও। প্রাচীন কালের দর্শনের গতি ছিল এক বিশ্বাতীত সত্তার দিকে যেখানে মানুষ মুক্ত হয় তার খর্বতা থেকে। সেখানে সে পেত অশরীরী বাণী ও সত্য, সুন্দর, মঙ্গলকে। মানুষ তৃপ্তি খুঁজেছে সেখানে কারণ সেইখানেই সে পেত তার স্বরূপকে।

একালের দার্শনিকেরা এ কথাকে অস্বীকার করেননি। তবে তাঁরা বলেন সভ্যতার ক্রমবিকাশে এই মর্ত্য নিচ্ছে অমৃতের রূপ। এই অমৃতকে রূপ দেবার জন্যই মানবসমাজে সব চেয়ে আজ বড়ো হয়েছে মানুষের অধিকারের কথা, মানুষের সুখের কথা। তাই আজ সাম্যবাদের অবতারণা। সকলের ভেতর সুখের ও আত্ম-বিকাশের সমান সুযোগ দেবার কথা হচ্ছে।

ধনী ও নির্ধনের শ্রেণীবিভাগ নষ্ট করে মানুষকে সমান অধিকার দিয়ে সকলেরই বিকাশের পথ উন্মুক্ত করতে হবে। সমাজতন্ত্রবাদীদের কথা এই। আর যাঁরা সমাজতন্ত্রবাদী নন্ তাঁরা জাতিবিশেষের সামর্থ্য ও শক্তিকে স্ফূর্ত করে শক্তিমানের যোগ্যতা ও প্রতিষ্ঠাকে স্থাপন করতে চাইছেন। সকল মানবেরই সমান অধিকার নেই, হতেও পারে না। প্রকৃতি বৈষম্যই সৃষ্টি করে; প্রকৃতিগত বৈষম্য নষ্ট

করলেই মানব সমাজের বৈচিত্র্য নষ্ট হয় এবং শক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হয়। শক্তির সঞ্চার প্রকৃতিগত বৈষম্য থেকে—এই বৈষম্য থাকবার জন্যেই মানুষের ভেতর আছে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা, যার ফলে তার যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা। গুণ ও শক্তিগত অধিকারের ফলে মানব সমাজে উচ্চ নীচ পরিস্থিতি সকল সময় বিদ্যমান থাকবে। সাম্যবাদের মূলে যে দৃষ্টি আছে তা অস্বাভাবিক। গুণ-বৈষম্য অস্বীকার করে বলেই তা সমাজের হিতকর নয়।

অবশ্য বর্ত্তমান জগতে একথাগুলি প্রধানতঃ উঠেছে অর্থ ও সাম্রাজ্য সমস্যা নিয়ে। জার্মানী ও ইতালী তাদের জাতীয় গৌরবে উদ্বুদ্ধ—রাশিয়া সাম্যবাদে। কিন্তু এ দুইএর ভেতর বর্তমান আছে একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা। রাশিয়া সমস্ত জগতে মানুষের ভেতর শ্রেণী বিভাগ চায় না এবং সকল মানব সমাজকে আহ্বান করেছে বিশ্ব-মানবসঙ্ঘ সৃষ্টি ক'রে একই ভাবে অনুপ্রাণিত করতে। অনেক বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও এদের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে মূল লক্ষ্য নিয়ে। ইতালী ও জার্ম্মানী প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে তাদের জাতির অভ্যুদয়। তারা শক্তিকেই জাতির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বলে মনে করে। রাশিয়া চাইছে সকল জগত থেকে অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য দূর করে ধনী ও শ্রমিক বিভাগ লোপ করতে।

জার্মানীর ও ইতালীর বর্তমান রাষ্ট্রদৃষ্টির পশ্চাতে একটা দার্শনিক দৃষ্টি আছে। ইতালীতে জেন্‌টিলে, জার্মানীতে

নীট্‌শে ও বর্তমানে অ্যাল্‌বার্ট লিবার্ট (Albert Liebert) রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক ভিত্তি রচনা করেছেন। জেন্‌টিলে বলেন, একটা গভীর আধ্যাত্মিকতার দ্বারা ফ্যাসিজিম পরিচালিত। ফ্যাসিজিম শুধু একটা দার্শনিক মতবাদ নয়, এটি ভাবনার নবীন প্রেক্ষা নয়,—জীবনের নবীন গতি। আধ্যাত্মিকতা এর স্বরূপ ও প্রধান বিশেষত্ব (Fascism & Culture)।

জেন্‌টিলের মতে সক্রিয় চৈতন্য বিশ্বের অন্তরে বিরাজ কচ্ছেন। সৃষ্টি তারই বিকাশ, চেতনার ধর্ম প্রকাশশীলতা, স্বচ্ছতা ও ক্রিয়াশীলতা। এই অবিশ্রান্ত আত্মপ্রকাশের গতি অনন্তে প্রসারিত। ইহার কোন চ্যুতি নাই। এ গতি ক্রমশঃই মানুষে স্ফূর্ত হচ্ছে, এ গতিতে মানুষে ঈশ্বরে এক গভীর সম্বন্ধ। অধ্যাত্মশক্তিকে সমর্পণ দ্বারা যত আকর্ষণ করতে পারা যায়, ততই বিরাটের শক্তিতে পরিচালিত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়-গ্রামের ও মনের সঙ্কীর্ণতা হতে মুক্ত হতে না পারলে অন্তরের গভীরতম প্রদেশে এ শক্তির স্ফুরণ সম্ভব নয়। একে পূর্ণরূপে জানবার এবং পূর্ণ বিকাশের আহ্বান করবার জন্য মানসিক ধারণার (intellectual concepts) অতীত হতে হবে।

মন তার চিন্তা প্রণালীর (thought concepts) ভেতর বদ্ধ। তা হতে মুক্ত হয়ে সে অন্তরতম শক্তির প্রেরণাকে অনুভব করতে পারে না। এ শক্তির স্বৈরগতি কিছুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এ গতি যার ভেতর যত প্রকাশিত, সে তত

উচ্চ অবস্থাপ্রাপ্ত, মানব নয় অতিমানব। অতিমানব অধ্যাত্ম শক্তিতে উদ্দীপ্ত, পরিচালিত। সাধারণতঃ বিজ্ঞানের দৃষ্টি একটা বাস্তবতার ভেতর আবদ্ধ, সে সত্যের অনুসন্ধান সেখানেই করে। মানুষের জ্ঞানের বিষয় হয়ে এ জগৎ উদ্ভাসিত, তার সত্তা জ্ঞানের অতিরিক্ত। কিন্তু যারা অধ্যাত্মবাদী তারা জ্ঞানের অতীত জগৎকে সত্য ও বাস্তব বলে স্বীকার করেন না। মানুষের সত্তা বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে স্থিত। স্বাধীনতা তার স্বরূপ, স্বতন্ত্র তার বিকাশ। এই চেতনার স্ফূর্তিই সৃষ্টি, বিজ্ঞান বিশ্বের মূল শক্তির স্বরূপ এখনও ধরতে পারেনি। তার শক্তি ও ক্রিয়া একটা স্থিতিশীল বাস্তব বিশ্বে আবদ্ধ। ফ্যাসিষ্ট দর্শন এরূপ স্থিতিশীলতার স্থানে চেতনার স্বাধীন গতিতে বিশ্বাসবান। এই অধ্যাত্মশক্তি কার্য্যকারণ নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব হতে মুক্ত।

এই অতীন্দ্রিয় জগতের সংবাদ আমেরিকার উইলিয়াম জেমসের ভেতর দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির জগত হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিধির জগতে আমাদের সত্তা বিলীন হয়, এক অনুভূতির অপ্রাকৃত ভূমিকা বলা যেতে পারে; আদর্শের প্রেরণার ইহাই প্রসূতি। আমাদের নিবাস স্থান এই অপ্রাকৃত বিশ্বে, ব্যবহার জগতে নয়, কিন্তু অপ্রাকৃত বলেই ইহা পূর্ণরূপে প্রাকৃত হতে ভিন্ন নয়,—ইহা অবশ্যম্ভাবিরূপে প্রাকৃত জগতে অব্যর্থভাবে ক্রিয়াশীল, দিব্য শক্তি-ধারা এই উর্ধ্বলোক হতে মর্ত্যলোকে নেবে আসে। (*The Varieties of Religions Experience*, page 519)

জন্ ডুইই বলেন (John Dewy) আধ্যাত্মিক সত্তাই সার সত্য। প্রাকৃত অপ্রাকৃতের বিভেদ সার্থকতা শূন্য। প্রাকৃত বলতে যা বুঝি তা সত্যিই অপ্রাকৃত। বিজ্ঞান প্রকৃতির স্বরূপের পরিচয় দেয়, প্রকৃতির স্বরূপ বুঝতে হলে, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে প্রবেশ করতে হবে এবং এই দৃষ্টিতে জ্ঞানের অতিরিক্ত প্রকৃতির কোন বাস্তবতা নাই।

জার্মানীতে হেগেলের বিজ্ঞানবাদের চেয়ে সোপেনহারের শক্তিবাদের আদর বেশী। অন্ততঃ জাতীয় জীবন এই শক্তিবাদকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশে তৎপর। নীট্শে মানবের ভেতর অতিমানবের প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন, এই অতিমানব বিশ্ব শক্তির প্রতীক, মানব স্থিতির উর্দ্ধে তার স্থান। জাতীয়তা বোধকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবের কথাটি তার ভিতর বেশ পরিস্ফুট নয়। হেগেলে অতিমানববাদ সুস্পষ্ট নয়। ব্যক্তির অতিমানবত্ব তার দার্শনিক দৃষ্টির সহিত সুসঙ্গত হতে পারে না। রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক স্বরূপতা স্বীকার করলেও, দান্তের ন্যায় বিশ্বসাম্রাজ্য বোধে তিনি উদ্বোধিত নন। তাঁর মতে বিরাটের অভিব্যক্তি প্রাশিয়ান ষ্টেটেই আবদ্ধ।

নব্য হেগেলবাদ (Neo Hegelianism) ব্যাখ্যাতা আলবার্ট লিবার্ট (Albert Liebert) হেগেলের জ্ঞানকে (reason) অধ্যাত্মশক্তির পর্যায়ভুক্ত করেছেন। জ্ঞান মানুষের ভেতর অধ্যাত্মবহ্নি। এই অধ্যাত্মবহ্নিতে অতিমানব দীপ্ত।

তিনি সাধারণ বুদ্ধির অতীত, দিব্যশক্তিসমন্বিত। এইরূপ শক্তিসমন্বিত পুরুষই জগতের স্বাভাবিক পরিচালক। বিশ্ব চেতনার আত্মধ্যানে উদ্ভূত, জগৎ এরই লীলায় স্পন্দিত প্রেমে সনাতন দ্বন্দ্বের (Dialectic) সমন্বয়।

প্রেমের ভেতর দিয়েই জীবন স্ফুর্ত হয় বিশ্ব সমন্বয়ে॥ প্রেমে সার্বভৌমিক জীবনছন্দের বিকাশ, এতে কোথাও একটু অসামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায় না। শক্তির বিকাশ দ্বন্দ্ব রহিত নয়—তার কাজই হচ্ছে অনমনীয়কে নমনীয় করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা। প্রেম সর্বত্র সমতা প্রতিষ্ঠা করে। আনন্দে বিশ্বের সমন্বয় উল্লাস জাগায়ে তুলে। নীট্‌শের অতিমানব প্রতিষ্ঠাও শক্তির মূর্তি ; শ্রী, সৌন্দর্য্য, বিশ্বছন্দের স্ফুর্তি নয়।

নীট্‌শে খৃষ্টের আদর্শকে নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে খৃষ্টের ভাব ও আদর্শ মানুষকে দুর্ব্বল করে এবং জীবনযাত্রার পথে মানুষকে অনুপযোগী করে তোলে। নীট্‌শের অতিমানব বীর্য ও শৌর্যের প্রতীক, অমানুষিক শক্তিতে পূর্ণ ; তার দৃষ্টি বদ্ধ ভোগও ঐশ্বর্য্যের দিকে, অনন্ত প্রসারিত প্রীতি ও শ্রদ্ধার দিকে নয়। বুদ্ধ বা খৃষ্ট নীট্‌শের মতে অতিমানব নন্। যে ধর্ম বা মতবাদ জীবনযাত্রায় মানুষকে অশক্ত করে সেই ধর্মকে তিনি শ্রদ্ধার অবদান দিতে রাজী নন্। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বিশ্বমানবের ওপর কর্তৃত্ব করা, বিশ্ববিধানের নেতৃত্ব করাই হল এরূপ অতিমানবের বিশেষত্ব।

মানুষের এরূপ অভ্যুদয় সম্ভব ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনের দ্বারা। সৃষ্টির অসামঞ্জস্যকে দূরীভূত করে বিশ্বশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা শক্তির কাজ, কিন্তু উদার সত্যের দৃষ্টি সম্পন্ন না হলে শক্তিমান স্ফীত গর্বে মহিমার স্থানে লাঘবতাকেই বরণ করে নেয়। শক্তি জ্ঞানের মহিমা হতে চ্যুত হলেই বিশ্বাত্মবোধ শূন্য হয়।

সত্য হতে শক্তিকে যারা পৃথক করে দেখেছেন তারা আধ্যাত্মিকতার নামে ধর্মান্ধতাকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। এরূপ শক্তির স্ফূর্ত্তিতে জ্ঞান বিজ্ঞানের সঞ্চার নেই। প্রাণের সঙ্কুচিত বৃত্তিতেই এর উৎপত্তি। সত্যে বিধৃত শক্তি সামঞ্জস্যের আশ্রয় ও কারণ। সত্য পূর্ণ সমন্বয়ের মূর্ত্তি। বিরুদ্ধ শক্তিকে সমন্বয় করেই সত্য জয়শ্রীমণ্ডিত। সকল বিরোধের অবসান সত্যের স্বরূপে। সত্য আজ খণ্ডিত বলেই সভ্যতার এত গ্লানি, তাই জাতি সংঘর্ষে বিশ্বমানবের অন্তর দলিত। সভ্যতার ইতিহাসে সত্যের ছন্দ মূর্চ্ছিত, স্বতঃস্ফূর্ত মানবতার সুষমা বিদূরিত। যেখানে শক্তি সত্যে আশ্রিত সে আধারের একটি উচ্চতা ও ব্যাপকতা আছে। সে বিশ্বকে দলিত ও মথিত করে না। তার প্রজ্ঞাচক্ষুতে আত্মস্বরূপে বিশ্বকে দেখে, বিশ্বের মধ্যে আত্মরূপকে দেখে। এ কথা খুবই ঠিক। অতিমানবের ভেতর যেমন আছে সত্তা, জ্ঞান ও শক্তির উচ্চতা, তেমনি আছে প্রেমের ব্যাপকতা। বিরাট বোধে এরূপ পুরুষের অন্তর বিশ্ব-মৈত্রীতে উদ্বোধিত।

অতিমানর সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন, প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী (cotra-natural) হয়ে নয়, বরং প্রকৃতির প্রভাবকে অতিক্রম করে (super-natural)। এ জন্যেই অধ্যাত্ম জীবনে প্রাকৃত জীবনের সকল ভয়, সন্দেহ দূরীভূত হয়। এ হল শান্তির জীবন, ছন্দের জীবন। এ হল জীবনের সাবলীল গতি। ছন্দে প্রকাশিত জীবনের সঙ্গীতে, জীবনের রূপবৈচিত্র্যে। অধ্যাত্ম জীবনের আস্পৃহা উচ্চ থেকে উচ্চতর অনুভূতির সঙ্গে অশরীরী তত্ত্বের দিকে ধাবিত। অধ্যাত্ম জীবন জ্ঞানে, ধ্যানে ও সৌন্দর্যে প্রকাশিত সর্বত্রই সে অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিকশিত, সহজ বুদ্ধির দ্বারা অধিকৃত। হিন্দুর দৃষ্টি এখানে নিবদ্ধ। এরূপ বিশ্বছন্দ শূন্য হলে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ চ্যুতি হয়। জার্মানী ও ইটালীতে হয়েছে তাই। উদারতার স্থানে এসেছে সঙ্কীর্ণতা।

সোপেনহার শক্তিবাদের আদর্শে এত আকৃষ্ট ছিলেন যে তিনি একস্থানে বলেছেন, "উদারতা ও বিচার বুদ্ধির উন্মেষে মানুষ শক্তির শাসন (authority) অবজ্ঞা করতে থাকে, মানব সমতা ও প্রজাতন্ত্রবাদ ষ্টেটকে ধ্বংস করেছে।" বস্তুতঃ ষ্টেট (কি জার্মানী বা কি ইতালীতে) সমষ্টিবোধের প্রতীক নয়, ইহা শক্তিমানের শক্তিব্যূহ, তারই ভেতর দিয়ে জাতীয় সমাজের পরিচালনা।

জার্মানী ও ইতালীর এরূপ আধ্যাত্মিক শক্তিবাদের স্থানে রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা। ফ্যাসিজম হতে

বলশেভিজিমের পার্থক্য বিশেষ করে দুটি বিষয় নিয়ে : একটি শক্তির স্বরূপ বিচারে, আর একটি সমাজের গঠন বিষয়ে। রাশিয়া শক্তির অধ্যাত্মরূপের স্থানে জড় রূপকেই গ্রহণ করেছে। শক্তির প্রাথমিক রূপে চেতনার স্বতঃ স্ফূর্তি নেই। মার্কসের ভাবধারায় হেগেলের ছায়া থাকলেও, হেগেল হতে তার মত সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন। বিশেষতঃ তত্ত্বের দিক দিয়ে ও ইতিহাসের স্বরূপ বোধের দিক দিয়ে।

হেগেলের মতে বিশ্বসৃষ্টি চেতনার আত্মপ্রকাশ। সৃষ্টির সহজ প্রেরণা সেখানে। মার্কসের মতে চেতনা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। জড়জগতের সম্বন্ধে মানুষের নানা প্রবৃত্তির উৎপত্তি। এগুলির সমষ্টি জ্ঞানের স্বরূপ। জ্ঞান বলে কোন পদার্থ বিশ্বের মূলে নেই। সত্তা (Being) জ্ঞানের উদ্বোধক। জ্ঞান সত্তার উদ্বোধক নয়।

বলশেভিজ্‌ম্ ও ফ্যাসিজ্‌ম্ এর এখানে মূলগত ভেদ। ফ্যাসিজ্‌ম্ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। বিষয়বস্তু অপেক্ষা না করে জ্ঞান স্বপ্রভায় উদ্ভাসিত। সৃষ্টি প্রারম্ভে জ্ঞান বিষয়-বিষয়ী বোধে বিকশিত। বিষয়কে অপেক্ষা করে উৎপত্তি হয় না। বলশেভিক মতে বিষয়নিরপেক্ষ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। বিষয় প্রধান, জ্ঞান অপ্রধান। বিষয় সংস্পর্শে চেতনার জাগরণ। বিষয় সম্বন্ধ ছিন্ন হলে চেতনার নিমীলন। বিষয় অতিরিক্ত হয়ে চিতি-স্পন্দন (Idee force) কিছু নেই। চিতি স্পন্দনের বিকাশ,

মানস রূপ ধারা (Ideas or concepts), বস্তুতঃ বিষয়েরই অবভাস। বিষয় মানসমূর্তি নেয়। তার ভেতর অবৈষয়িক স্থির বিজ্ঞানের কোনও রূপ নেই।

মানুষ স্পন্দনাত্মক বিশ্বে অবস্থিত। বাহিরের স্পন্দনের আঘাতে তার জ্ঞানের স্ফূর্তি। এ স্পন্দন বাস্তব পদার্থ। জ্ঞান ইহার প্রতিক্রিয়া। এই স্পন্দন ক্রমশঃ নবীন বিকাশ প্রাপ্ত হয় যা এর প্রাথমিক স্বরূপে নেই। শক্তি হতে প্রাণ, প্রাণ হতে মন, মন হতে বিজ্ঞান। শক্তির স্পন্দন ক্রমশঃ ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। এ রূপগুলো এক পর্য্যায়ভুক্ত না হলেও, শক্তির স্পন্দন হতে সকলে উদ্ভূত। একই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ। প্রাচীন হতে নবীনের অভ্যুদয়, কিন্তু নবীন প্রাচীনের পূর্বানুবৃত্তি নয়। একেই বলে নবাগম অভিব্যক্তি-বাদ (Theory of Emergent Evolution)। চেতনার কোন নিত্যস্থিতি এতে স্বীকৃত হয়নি। চেতনা অভ্যুদয় পর্যায়ে একটি নবীন স্ফূর্তি। শক্তিবিজ্ঞান, প্রাণবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান অভিব্যক্তিবাদে এগুলি বিজ্ঞানের ক্রমিক বিকাশ।

এই নবাগম অভিব্যক্তিবাদে সৃষ্টিতে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ স্বীকৃত হয়। বীজে সমগ্র বিশ্ব অনুস্যূত হয়ে থাকে না—প্রকৃতি একই পথ সর্বত্র অনুসরণ করে না। প্রকৃতি স্বৈরগতি। তার গতির কোনও নিয়ম নেই। তার প্রকাশ এক পথ অনুসরণ করে না। এফ. এঞ্জেলস্ (F. Engels) বলেছেন—'প্রকৃতি

এক সনাতন গতিকে অবলম্বন করে অভ্যুদয়ের বিকাশে বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি সঞ্চার করে না। কিন্তু বাস্তব ও নবীন ইতিহাস রচনা করে। বিশ্বের মূলে কোনও বিজ্ঞানশক্তি বা অধ্যাত্মশক্তি নেই। ষ্ট্যালিন (Stalin) বলেন, বিশ্ব স্ফুর্ত হচ্ছে জড়াত্মিকা প্রকৃতির উন্মেষ অনুযায়ী। এর জন্য কোনও বিশ্বাত্মিকা অধ্যাত্মশক্তির প্রয়োজন নেই।' (Dialectical and Historical Materialism by Stalin). লেনিন (Lenin) বলেছেন, 'চেতনা সত্তারই অবভাস'। "প্রকৃতি সমষ্টিগতভাবে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করলেও সৃষ্টির ক্রম-উচ্চতার পর্যায়ের দিকেই ধাবিত" (Engel's Socialism Utopian & Scientific), ইতিহাস নবীনের ক্রমিক বিকাশ, সনাতনের শাশ্বত কাহিনী নয়।

দার্শনিকতায় ফ্যাসিজ্‌ম্ ও বলশেভিজ্‌ম্ পূর্ণ বিরুদ্ধমত। এইজন্য তাদের সামাজিক সংস্থিতিও বিভিন্ন। ইটালী ও জার্মানীতে অধ্যাত্মশক্তি শীর্ষস্থানে। এইজন্য ফ্যাসিষ্ট ষ্টেটের একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে। জড়শক্তিকে অবলম্বন করে অধ্যাত্মশক্তি স্ফুর্ত্ত হতে চায়। এটা লক্ষ্য হলেও চেতনার দ্বারা জড়ের কোন রূপান্তরের কথা শুনতে পাই না। অধ্যাত্মের নামে ফ্যাসিষ্ট ষ্টেট্ পূর্ণভাবে শক্তিরই আধার হয়েছে। সে শক্তির আধ্যাত্মিকতা হয়ত জাতীয় গৌরবের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। তার ভেতর বিশ্বচ্ছন্দের অন্ততঃ কোন প্রকাশ নেই। রাশিয়াতে বাস্তব সুখসম্পদের কথা এত বড় হয়েছে যে রাশিয়া কোন স্বপ্ন-বিলাসী অমরার

সুখের কল্পনা করে না। সোভিয়েটে ফ্যাসিষ্ট ষ্টেটের ন্যায় কোন আধ্যাত্মিক রূপ নাই। এরূপ আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে সোভিয়েটের কোন লক্ষ্যই নাই। ষ্ট্যালিন বলেছেন, রাশিয়াতে মার্কসিজ্‌ম্‌ ও লেনিনিজ্‌ম্‌-এর শক্তির মূলীভূত কারণ এই যে ইহা বাস্তব জীবনের জড়সম্পদ বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কোনও চেষ্টা করেনি। (Dialectic & Historical Materialism. Pp. 18-19)

দার্শনিকতা যাহা হউক, জার্মানী ও রাশিয়ার লক্ষ্য ফলতঃ একই,—এমন সমাজ বিধান রচনা—যাতে মানুষের শক্তি বৃদ্ধি হয়ে প্রভূত সুখ সম্পদ হতে পারে। রাশিয়ার স্বপ্ন এই যে বিশ্বে মানুষের সমান অধিকার দিয়ে, মানুষের সব অভাব দূরীভূত করে, অখণ্ড মানব সমাজ রচনা করা। অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে উৎপন্ন হয় যত সমাজব্যাধি, উচ্চনীচের সংস্থিতি। প্রকৃত মানবতা সাম্যের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত। জার্মানী ও ইটালীর দৃষ্টিতে প্রকৃতির বৈষম্য আছে, এবং প্রকৃতিগত বৈষম্য নিয়ে মানব সমাজে শ্রেণী বিভাগ স্বাভাবিক।

রাশিয়ার আস্পৃহা প্রাণের পূর্ণ বিকাশ। জার্মানী ও ইটালীর আধ্যাত্মিকতার দিকে দৃষ্টি থাকলেও ফ্যাসিষ্ট ষ্টেটের বিকাশের ভেতরে কোনও অধ্যাত্ম স্ফূর্তির পরিচয় নেই। প্রাণস্তরের বিকাশকে অতিক্রম করতে পারে নেই। এজন্যই ফ্যাসিষ্ট ষ্টেট্‌ ও সোভিয়েট দুই-ই নিগড়বদ্ধ সমাজের

ছবি (mechanised society)। মুক্তি ও সমতার ছন্দে সমাজশক্তি স্পন্দিত নয়।

জীবনে একটি অস্পৃহা আছেই। কিন্তু এই আস্পৃহার রূপ নিয়ে ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে—পাশ্চাত্যের অনেকের দৃষ্টি এ রূপকে প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত করে। ভারতের দৃষ্টি এ রূপকে আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত করে। এজন্যে ভারতে এ রূপকে এবং তার সংবেদনাকে চিরকাল আত্মার স্বচ্ছ বিকাশের সঙ্গে স্থান দিয়েছে। উচ্চ অভিব্যক্তির ভেতর একটি দিব্য আস্পৃহা আছেই। এ আস্পৃহা প্রাকৃত নয়, তার স্বরূপ অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বলেই সে প্রাকৃতকে নিজের ছন্দের দ্বারাই রূপান্তরিত করে তোলে। এখানে ভারতীয় দৃষ্টির বিশেষত্ব।

মানুষের ভেতর আছে যে প্রাণের প্রেরণা তাকেই অবলম্বন করে মনস্বীরা সন্ধান পেয়েছেন আরও উচ্চতর বিকাশের দৃষ্টি। ফলে পাশ্চাত্যে অনেকের দৃষ্টি এ জড় শক্তির আকর্ষণ থেকে মুক্তি পায়নি। তাদের ভাবধারার ভেতর জড়েরই স্থান প্রধান। জড়প্রকৃতি বিশ্ব-মাতৃকা। তাকে অতিক্রম করে চেতনার ও অধ্যাত্মরূপের অভিব্যক্তির আস্পৃহা উৎপন্ন হয়। জড়ের ভেতর চেতনার ক্রিয়া আছে; কিন্তু চেতনা জড় থেকে বিকশিত হয় না। উপনিষদের দৃষ্টি জড় বলে কোন পদার্থই স্বীকার করে না; চেতনার বিকাশই বিশ্ব, এ বিকাশের তারতম্য ভেদে জড়তার জ্ঞান হয়—কারণ সেখানে

পূর্ণ চেতনার সঞ্চার নেই। চেতনার সঞ্চার হলেই জড়তা নষ্ট হয়ে যায়। চৈতন্যের বিকাশের তারতম্য থাকলেও চৈতন্যে ভিন্ন বস্তু নেই। স্বভাব বিচ্যুতির জন্যে মানুষের চেতনার সীমার অনুভূতি—এই স্বভাবের পূর্ণ পরিস্থিতি তার পরম পরম কাম্য। এই পরিস্থিতি দেয় তাকে তার বিরাট স্বরূপের অনুভূতি, যা জ্ঞানে স্বচ্ছ, আনন্দে পূর্ণ, সকল বন্ধন হতে মুক্ত।

উপনিষদের এ মতের ছায়া Plotinusএ সুস্পষ্ট। Plotinus অদৃশ্য ও অব্যক্তের উপাসনাই করেছেন। পরতত্ত্ব জ্ঞানে বা ধ্যানে পাওয়া যায় না। এর স্বরূপ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অতীত। এ তত্ত্ব তা নয়, সে সব শক্তি নয়, যা ধ্যানে বা অলৌকিক দর্শনে (vision) পাওয়া যায়। একে ঈশ্বর বলে ভাবলেও, এর স্বরূপচ্যুতি হয়। ঈশ্বরে সত্তার ব্যক্তিত্ব আছে। এ কিন্তু নির্ব্যক্তি। বিশ্বস্থ বিজ্ঞানের (Cosmic Ideation) এ অনাদি নিস্তব্ধতার (Eternal Silence) পর্যায়ে স্থান নেই। বিজ্ঞান-পুরুষের জ্ঞান একে নির্ণয় করতে পারে না। এ সনাতন স্তব্ধতা সকল বিজ্ঞানের অতীত। এইখানেই ঔপনিষদ বিদ্যা লাভ করে চরম সার্থকতা। ঔপনিষদ বিদ্যার এই শ্রেষ্ঠ রূপ। এ বিদ্যাকে অধিকৃত করবার জন্যে সত্তার সব স্তরে জাগিয়ে তুলতে হয় বিরাটের অনুভূতি। বিরাটের অনুভূতি প্রাণে, মনে, বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বমন, বিশ্ববিজ্ঞানের পরিচয় দেয়। সামর্থ্যে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, পূর্ণ করে। এর প্রত্যেক স্থিতিই

উচ্চতর স্থিতির দিকে অগ্রসর করিয়ে দেয়। ঔপনিষদ বিদ্যা এরূপে আমাদের সত্তার সব লাঘবতা দূর করে ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্ম-শক্তিতে পূর্ণ করে।

পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবাদীরা যে শক্তিস্ফূর্তিকে জীবনের চরম সার্থকতা বলে মনে করেন তা বস্তুতঃ দিব্যশক্তি নয়। দিব্য-শক্তির আবির্ভাবে প্রাকৃত দ্বন্দ্বের, অসমতা ও অস্বাচ্ছন্দ্যের তিরোধান। শক্তি সাধারণ রূপে ইচ্ছাতে বিকশিত। ইচ্ছার স্বরূপ বাধা জয় করে বিকশিত হওয়া। কিন্তু অধ্যাত্মশক্তি লীলায়িত স্ফূর্তি। যখন জড়তা ও রূঢ়তা, অনমনীয়তা স্বতঃ স্ফূর্ত বিকাশে বাধা দেয়, ইচ্ছার তখন স্ফুট প্রকাশ। বিশ্বের অন্তরে এমন শক্তি ক্রিয়াশীল যা বিশ্বকে সকল মলিনতা হতে মুক্ত করে প্রাণের ছন্দে, জ্ঞানের দীপ্তিতে, আনন্দে উল্লাসে পূর্ণ হয়। এরূপ শক্তির বিকাশে মানব সমাজের অন্তরে জড়তা ও কাঠিন্য দূরীভূত হয়। বিশ্ব সত্তার উদ্বোধনে ঋষিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের সভ্যতার ভিত্তি তপোবনে বা নৈমিষারণ্যে, রাষ্ট্রে নয়। কত রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন হয়েছে— কিন্তু ঋষিসংঘের এই আদর্শ এখনও অম্লান, এবং ইহা সমাজকে উদ্বোধিত করছে মহামানবতার দিকে। সাম্রাজ্যগৌরব ভারতবর্ষ কখনও করেনি, মানব সমাজের ভেতর সনাতনকে অনুভব করা, সনাতনকে বরণ করাতেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

বর্তমান ভারতেও এ দৃষ্টি হতে বিচ্যুত হয়নি, যদিও তার জীবনে সকল দিকে নবীনতার স্ফূর্তি হচ্ছে। ভারতের সমাজ

প্রাচীন সংস্থিতিকে ত্যাগ না করলেও সমাজে নবীন ভাব প্রবিষ্ট হচ্ছে। রামমোহন রায়ের সময় হতে এ পর্যন্ত একটা নূতন ভাবধারা ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে, প্রচারিত হয়েছে। প্রাচীন সমাজের পরিস্থিতিকে এ ভাবধারা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেনি। মানবত্বের মহিমা এবং সমাজে গতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা রামমোহন রায়ের সময় হতে আরম্ভ। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ সকলেই ভারতের নবজাগরণের সাহায্য করেছেন। বিবেকানন্দের দৃষ্টি বেদান্তের মধ্যে নিবদ্ধ থাকলেও, তিনি এ অদ্বৈত বেদান্তের ভেতর মানবের মহিমা ও অখণ্ড ভারতবর্ষের একটা মানস-রূপ দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার বিশ্বমানবের আদর্শের ভিত্তি পেয়েছেন ব্রহ্মের বিশ্বরূপে। শ্রীঅরবিন্দর জাতীয়তা বোধের মূল ভিত্তি হচ্ছে ভারতের প্রাচীন আদর্শ। তিনি চাইছেন দেব-বুদ্ধিকে স্থাপিত করে সমাজকে দিব্যসম্পদে ও বিভূতিতে পূর্ণ করতে, জীবনের ভেতর অধ্যাত্ম শক্তি ও সামর্থ্যকে জাগিয়ে তুলে, মানব সমাজকে বিশেষতঃ ভারতের অন্তঃসত্তাকে এ আদর্শে অনুপ্রাণিত করে ঋষিসংঘ স্থাপন করতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী সমাজে জ্ঞানদীপ্ত, পূতচরিত্র, বিশাল হৃদয় ব্রাহ্মণের ওপর সমাজের নেতৃত্বভার অর্পণ করেছেন। বাল গঙ্গাধর তিলক গীতার নিষ্কাম ধর্মের ভেতর বর্তমান ভারতের মুক্তির পথ দেখে, জাতিকে কর্মপ্রতিষ্ঠাদ্বারা শক্তিমান করতে চেয়েছিলেন। তাঁরও আদর্শ ছিল জ্ঞানে কর্ম প্রতিষ্ঠা। কর্মসন্ন্যাস প্রকৃত সন্ন্যাস নয়। নিষ্কাম কর্মই প্রকৃত সন্ন্যাস।

মহারাষ্ট্রে এরূপ দৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হই। রামদাস স্বামীর দাসবোধে, গীতার জ্ঞানেশ্বরী টীকাতেও এর ছায়া আছে। এরূপে প্রাচীনের আদর্শের সঙ্গে পূর্ণ সংযোগ-সূত্র রক্ষা করে নবীন জাতীয়তার উদ্বোধন হয়েছে।

উপনিষদের ঋষিসংঘের আদর্শে হিন্দু সমাজ আজও অনুপ্রাণিত। সমাজ জীবনের পরিণতি সেখানে। ব্রহ্মওজঃ-সম্পন্ন পুরুষেরা সমাজের স্বাভাবিক পরিচালক। ওজঃ শক্তি-সম্পন্ন হলে মানুষ বিশ্বছন্দে চালিত হয়।

বর্তমান ভারতের নেতৃত্ব কর্‌ছেন মহাত্মা গান্ধী। বিরাট মানবত্ববোধসম্পন্ন তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রেমস্বরূপ। বিশ্বকল্যাণে উদ্বুদ্ধ ভারতবর্ষে মানবপ্রীতি, মানবশ্রদ্ধা তিনি বিশেষভাবে প্রচার করেছেন। ভারতের অগণিত অস্পৃশ্য সমাজকে তিনি পূত ও পবিত্র করে তাদের জন্যে শ্রদ্ধার ও অধিকারের দাবী করেছেন। গান্ধীজির এই মানবকল্যাণের স্পৃহা তার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আন্দোলনে দিয়েছে এক অভিনব রূপ।

গান্ধীজি অখণ্ড মানবত্ব বোধে অনুপ্রাণিত। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি হিন্দু সমাজের বর্ণবৈষম্য দূর করতে যেমন তৎপর তেমনি বিশ্বে রাষ্ট্রবৈষম্য দূর করতে উৎসাহান্বিত। ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে তিনি মানবতার বেদীতে উন্নীত করতে চেষ্টিত। জগতের ইতিহাসে অহিংসা ও প্রেমের দ্বারা রাষ্ট্রীয়

ব্যাপারের মীমাংসার চেষ্টা এই প্রথম। তাঁর এই অবদান ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজ বিশ্ব-সভ্যতা বিপন্ন। পাশ্চাত্যে শক্তিবাদ ও বিজ্ঞান এমন প্রতিষ্ঠালাভ করছে যে শক্তির আতিশয্যে উদার সত্যের জ্ঞান স্তিমিত, অম্লান প্রেম সঙ্কুচিত। হিংসা এমন রূপে মানব সমাজকে গ্রাস করেছে যে অহিংসার সাধনায় সিদ্ধ না হলে সমাজ ও ধর্ম নষ্ট হবে। তাই আইন্‌ষ্টাইন বলেছেন, "নির্যাতিত জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি (গান্ধী) এক অভিনব নৈতিক উপায় উদ্ভাবন করেছেন, একান্ত নিষ্ঠা ও অপরিসীম শক্তির সাহায্যে তার পরিচালনা করছেন। মানব জাতির সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সমসাময়িক এমন একটি জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয় হয়েছে যার আলোকে অনাগত ভবিষ্যতের বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত হবে।"

সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি যে বিরাট সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করতে চাইছেন তা সম্পূর্ণ নতুন না হলেও তা সত্যই প্রাচীন-পন্থীর দৃষ্টি হতে পৃথক। রামমোহন রায় থেকে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সকলেই ভারতবর্ষে একটা নবীন সুরের প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্মকে অনেকেই ত্যাগ করেন নি, গান্ধীও করেন নি। কিন্তু প্রাচীন সংস্থিতির বর্ণাশ্রম ধর্মের যে রূপ পাওয়া যায়, এঁরা, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধী তা স্বীকার করেন নি। বর্ণাশ্রম প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যবস্থা—গুণগত বিধান। কিন্তু এর দ্বারা মানব সমাজে কোন স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনশীল জাতি-সংঘ প্রস্তুত হয় না।

রাজা রামমোহন সংস্কৃত সম্পন্নব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলতেন। ব্রাহ্মণ জাতি নয়, মানবত্বের শ্রেষ্ঠ ও শুভ্র বিকাশ (রাজার বজ্রসূচী উপনিষৎ দ্রষ্টব্য)। এসব আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ভারতীয় দৃষ্টির ভেতর একটা ধারাবাহিক সূত্র আছে। একত্ব-বোধের ভেতর বৈচিত্র্যানুভূতি, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের দৃষ্টি। ভারতীয় জীবনধারার এই বৈশিষ্ট্য। বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে নয়, তার ভেতর দিয়ে এককে অনুভব করেই বচিত হয়েছে সমাজের ভিত্তি। এ বৈচিত্র্যকে স্বীকার না করলে সমাজজীবন প্রতিষ্ঠ হয় না। একে সামঞ্জস্য করবার চেষ্টাতেই হয় সমাজের নানা রূপের সৃষ্টি। কোন সমাজেই এক স্থিতিশীল রূপ নেয় না, নিলেও বেঁচে থাকে না। গতিশীল সমাজ চিরকালই বেঁচে থাকে বৈচিত্র্যকে বুঝে, তার বিকাশ, প্রকার, ভেদকে সামঞ্জস্য করে।

সমস্ত জগতের ও ভারতের এই বর্তমান পরিস্থিতির ভেতর ব্রহ্মবিদ্যার উপযোগিতা আছে কিনা তাই বিবেচ্য। বহুতর পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে মানবকল্যাণ ধর্মের আদর্শ আজ সকলে গ্রহণ করছেন। সত্যই মানব জগতে এমনি একটা সময় এসেছে যে সার্বভৌমিক ধর্মের স্থানে মানব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

এই যুগে ভারতবর্ষ নবীন ভাবে উদ্বোধিত ও অগ্রসর হলেও তার সনাতন দৃষ্টি কোথায় তাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

মানুষের ধর্মের দুই রূপ। একটি শাশ্বত, আর একটি অনিত্য। একটি মানুষের প্রকৃত সত্তার পরিচায়ক, অপরটি কাল ও দেশানুযায়ী পরিস্থিতির ব্যবস্থা। কাল বিশেষের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করতে হয়, একেই কালধর্ম বলে (time spirit)। কাল বিশেষে ও দেশ বিশেষে মানুষের ভাবনা ও পরিস্থিতি বিভিন্ন। শক্তির বিশেষ ভাব গ্রহণ করেই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। কালের ধর্মে সমাজ রূপ নিচ্ছে নানা ভাবে। তার পরিচয় নিত্যই পাচ্ছি। বর্ণাশ্রম ধর্মের আধুনিক রূপের শৈথিল্য সুস্পষ্ট।

কিন্তু এ দেশকালের বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে মানুষের চিত্ত কালের অতীত সনাতন সত্যের সঙ্গে পরিচয় হতে চাচ্ছে, কারণ মানুষের মূল সেখানে। শুধু কি তাই, সৃষ্টির ভেতর দিয়েও সত্যের অনন্ত প্রকাশ ও রূপের কোন লাঘবতা হয়নি। মূর্তবিশ্বে সত্যের অমূর্ত রূপের পরিচয়। বিশ্বাতীত হয়েও সত্য বিশ্বস্থ। কোন দেশ ও কালে সত্যের বিকাশ বিশেষের ভেতর দিয়ে স্ফূর্ত হয় তার বিরাট সংবেদনা। কারণ, তাই তার স্বরূপ। স্বরূপ চ্যুতি সত্যের কখনই হয় না।

ভারতবর্ষের সভ্যতার বিকাশ হয়েছে এ সনাতন সত্যকে অবলম্বন করে। এ তামস স্থিতি নয়—চেতনার স্থিতি। বিপুল সঞ্চয়ে যে পরিমাণ মানব সমাজে সুখ সম্পাদনের কথা ছিল তা হয়নি। বরং বৈষম্য সৃষ্টি করেছে সর্বত্র, শাশ্বত ও দিব্য মানবধর্ম হতে আমরা চ্যুত হয়েছি।

উপনিষদের দৃষ্টি দেয় এ বিশালতা যেখানে মানুষের অন্তঃসত্তা এক অখণ্ড সত্তারূপেই প্রতীত, যেখানে বিশ্বমানবের মৈত্রী পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। মানবের এই অখণ্ড বোধ উপনিষদ যেমন দেয়, জগতের কোন সাহিত্যই সেরূপ দেয় না। এজন্যেই বর্তমান সভ্যতার মধ্যে ভারতে ব্রহ্মদৃষ্টির আবশ্যকতা এখনও রয়েছে। সকল দেশের মানব সমাজ আজ নানা সূত্রে একত্রিত হচ্ছে। কিন্তু এ ব্রহ্মদৃষ্টির ভিত্তিতে মানব সমাজে একীকরণ-বোধ স্ফুট নয় বলেই আজ নানাবিধ কোলাহলের সৃষ্টি। বর্তমানে উপনিষদ দৃষ্টির আমাদেরও বিশেষ আবশ্যকতা আছে। নবীন জীবনের ঊষার আলোকে ভারতের দিগন্ত সমুদ্ভাসিত। নবীন আশায় উৎফুল্ল হয়ে ভারত আজ মানব-সংঘে যোগদান করবার জন্যে উৎসুক। এ পুণ্যদিনে ভারতের দৃষ্টি কি শুধু তার জাতীয় মুক্তির দিকে বদ্ধ থাকবে? না বোধিসত্ত্বের ন্যায় ভারত তার বিশ্বকল্যাণের স্পৃহা নিয়ে বিশ্ব-সভায় যোগদান করবে? ভারতের কল্যাণবাণী ও বিশ্বাত্মার সন্ধান শুধু ভারতেই বদ্ধ থাকবে না—এই হবে মানব সভ্যতার প্রধান ভিত্তি। এর রচনা ভারতে আরম্ভ হয়েছে— বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "মূর্খ ভারতবাসী, অজ্ঞান ভারতবাসী আমার ভাই।" রবীন্দ্রনাথের মানসলোকের ভারততীর্থ বাস্তবেরই পরিচয়। এ ভারতে নানা ধর্মের বেদী রচিত হয়েছে—এ ভারতে নানা সভ্যতার সংমিশ্রণ হয়েছে—কিন্তু ভারতের শান্ত তপোবনে যে বিরাট ছন্দে অখণ্ডাত্মার বোধে দেব, মানব, সকলেই উদার মহনীয় সত্তার বিরাটানুভূতিতে মগ্ন হতেন, সে ছন্দের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হয়েছে বিশ্বের অন্তরে। কোন

সভ্যতা অন্তরের দীপ্তি ভিন্ন, বাইরের কোন সংযোগ সূত্রে অখণ্ড মানব সমাজ গঠিত করতে পারে না।

এ সমতার বাণী ভারতের শ্রেষ্ঠ বাণী হলেও যোগ্যতার দৃষ্টি হতেও ভারত কখনও চ্যুত হয়নি। যোগ্যতা না থাকলে সমতার বাণীর কোন অর্থ থাকে না। এ যোগ্যতা অর্জন করবার জন্যেই উপনিষদে যোগানুশাসনের কথা। জ্ঞান দেয় সমতা, যোগ দেয় শক্তি। এ শক্তির আধার হচ্ছে ছন্দ-প্রতিষ্ঠিত প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান। এ ছন্দোবদ্ধ জীবনে বিশ্বছন্দ বিধৃত। বিশ্বছন্দে শক্তির পূর্ণ স্ফুরণ। সমতার ওপর ছন্দ প্রতিষ্ঠিত বলেই শান্তির সঙ্গে সূক্ষ্ম শক্তির উদ্বোধন। সম বুদ্ধির স্বরূপ সর্বত্র এক হলেও ছন্দের তারতম্য অনুযায়ী যোগ্যতার নির্দেশ। ছন্দের গৌরবে জীবন যোগ্যতায় পূর্ণ হয়। ছন্দ যেখানে ব্যাপক, শুভ্র মানবত্ব সেখানে স্বতঃ স্ফুর্ত। ছন্দের বেগ এরূপ অবস্থা লাভ করতে পারে যে, মানবত্বের স্থানে অতিমানবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মানবত্ব দিব্যশক্তির বিকাশে পূর্ণ, সমতাবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত। এরূপ পুরুষ বিশেষকে উপনিষদের ভাষায় ঋষি বলা হয়। উদার জ্ঞানের সঙ্গে অলৌকিক শক্তির সংমিশ্রণই ঋষিত্বের নিদর্শন। জীবনের মূলে আত্মশক্তি বর্তমান থাকার জন্যে ভারতীয় সভ্যতার লক্ষ্য হচ্ছে আত্মানুভূতির ওপর সমতা ও যোগ্যতা স্থাপন করা। এ যোগ্যতা শুধু সৃজন শক্তি নয়; এ বিশ্বের সঙ্গে ঐক্যের অনুভূতি। চেতনা অন্তর্যামী। এর নিবাস অন্তরে ও বিশ্বকেন্দ্রে। উপনিষদ জীবনের সব চাঞ্চল্য ও সব গতিকে

অতিক্রম করে এই শান্ত শিব স্বরূপ তত্ত্বের আরাধনা করেছে। এ তত্ত্বের বিরাট দৃষ্টিতে সব ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা ও কামনা নিয়মিত হয়ে গতির ঊর্ধ্বে স্থিতি লাভ করি। এ স্থিতি সর্বত্র বিদ্যমান, অখণ্ড। এই অখণ্ড স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'লে হৃদয়ের, বুদ্ধির আবরণ অন্তর্হিত হয়। চেতনার সমতার দৃষ্টি লাভ হয়।

এই উন্মুক্ত চেতনায় পরিস্থিতি লাভ করতে পারলে গতির অবরোধ হয় না। জীবনের গতি স্বচ্ছ, সরল, সরস, শুভ্র ও ছন্দ যুক্ত হয়। অন্তঃকরণ প্রচ্ছন্ন বাসনা হতে মুক্ত হয়। ক্ষীণ সত্তা হতে মুক্ত হয়ে অসীমের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হই। এ প্রতিষ্ঠা শুধু অপরিচ্ছন্ন বোধিতে প্রতিষ্ঠিত করে না, অন্তরকে শুদ্ধ প্রেমে পরিপূর্ণ করে। আত্মপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিই প্রকৃত প্রেমিক। প্রেম হৃদয়ের বৃত্তি। হৃদয় যখন জীবত্বের সংস্কার হতে মুক্ত তখন সেখানে আত্মজ্ঞান উদ্ভাসিত, প্রেম প্রতিষ্ঠিত। প্রেম আত্মার বিশ্বদৃষ্টি। আত্মার এ উদার দৃষ্টির ওপর সমাজ-সংস্থিতির ব্যবস্থা। সমাজ অসীমের ছায়া, অখণ্ড মানবত্ব বিরাটের প্রতীক। হিন্দুর দৃষ্টিতে মানব-সমাজ অখণ্ড সমাজ, এর কোন দেশগত পরিধি নেই। মানব-সমাজের সমতা ব্রহ্মদৃষ্টির ওপরই নির্ভর করে। যেখানে সমতা অন্য কোনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে তার ফল ক্ষণস্থায়ী। বৈষম্য প্রকৃতি ধর্ম, সাম্য জ্ঞানের ধর্ম। বৈষম্য শক্তির ধর্ম। শক্তির অন্তরালে জ্ঞানের এ সমতার দৃষ্টি না থাকলে প্রকৃতির বৈষম্যের দ্বারা মানুষ আকৃষ্ট হবে এবং সে বৈষম্য ভেদ-নীতির প্রবর্তন করবেই।

উপনিষদের দৃষ্টি সকল বৈষম্যকে অতিক্রম করেছে জ্ঞানের দৃষ্টিদ্বারা এবং এ জ্ঞানকে অবলম্বন করে খণ্ডের ভেতর সন্ধান পেয়েছে অখণ্ডের, বৈষম্যের ভেতর সন্ধান পেয়েছে পরম সমতার, সকল স্ফূর্তির ভেতর সন্ধান পেয়েছে নিত্য স্ফূর্তির। এ দৃষ্টি স্ত্রী পুরুষের ভেতর, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়ের ভেতর প্রতিষ্ঠিত করতে পারে মৈত্রী, সমতা ও শান্তি। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে পরতত্ত্বকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হয়েছে, যে ব্রাহ্মণ, যে ক্ষত্রিয়, তাকে ব্রহ্ম হতে ভিন্ন মনে করে সে সত্য হতে চ্যুত হয়। যে বৈশ্য তাকে ব্রহ্ম হতে ভিন্ন মনে করে সে মিথ্যার আচরণ করে।

অভিন্নতায় অনুভূতি যখন শুদ্ধ হয়ে জাগ্রত হয়, তখন মানুষ তার প্রকৃতিগত বৈষম্য বা সংকীর্ণতা হতে মুক্ত হয়ে বিরাটের অনুসন্ধান পায়। এ বিরাটের অনুভূতিই সমাজ সংস্থিতির প্রধান ভিত্তি। বৈষম্যকে অতিক্রম করতে পারলে বিরাটের ভেতর অখণ্ড মানব-সমাজের মূর্তি দেখতে পাই। বিরাটের অনুভূতি জীবনের সকল বিকাশকেই ছন্দায়িত করে, বৈশিষ্ট্যের ভেতর সমতার দৃষ্টি স্থাপন করে। উপনিষদের এই উদার দৃষ্টির আবশ্যকতা আজকার দিনেও আছে। রাশিয়ার মানব-সমাজের দৃষ্টি খাঁটি অখণ্ড দৃষ্টি নয়। স্বভাবগত বৈষম্যকে অনৈসর্গিক উপায়ে সাম্য করবার চেষ্টা করছে। সত্যের সাম্য মূর্তির সঙ্গে রাশিয়ার পরিচয় নেই। বাঁচবার অধিকার বা ইচ্ছা (right or will to live) প্রাণস্তরের স্বাভাবিক ধর্ম হলেও, একেই ভিত্তি করে কোন বিরাট

সমাজ রচিত হয় না, যদি মানুষের সত্তার অভিন্নতা জাগ্রত না হয়।

রাশিয়ার সমাজ বিধানে অখণ্ড মানব সমাজ বিধানের কথা থাকলেও তার প্রতিষ্ঠা প্রাণস্তরে। তাই বাঁচবার অধিকারের কথা সেখানে বড়। প্রাণস্তরের সমতা বিধান করা জ্ঞানের ঊর্ধ্ব আলোকের সাহায্য ভিন্ন হবে না। প্রাণ স্বাভাবিক স্বৈর গতি। তাকে নিয়মিত করতে পারে অন্তরের আলো। বাইরের বিধান নয়, সেই বিধান যতই সুসঙ্গত হোক্ না কেন।

প্রকৃতির বৈষম্যকে জ্ঞানের সাম্য দ্বারা নিয়মিত করতে না পারলে, যে কল্পলোকরচনায় রাশিয়া উদ্বুদ্ধ, তা সত্য হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে না। মানুষ অন্তঃর্বহিঃপ্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল। সমাজ-জীবনের সম্বন্ধ ও প্রতিক্রিয়ার ফলেই তার সবটার বিকাশ হয় না। অন্তরে বিকাশের শক্তি রয়েছে যা স্বতঃ স্ফূর্ত।

যোগ্যতানুযায়ী নির্বাচন-প্রথার কিছু সত্য থাকলেও তার ভেতর এ ব্রহ্মদৃষ্টির সমতার অভাব আছে। ব্যক্তিবিশেষের সামর্থ্যানুযায়ী সভ্যতার রচনা যতই সুন্দর হোক, তার দ্বারা সকলের ভেতর একটা ব্যাপক দৃষ্টি এবং জ্ঞানের সমতার প্রতিষ্ঠা হয় না। এজন্যেই বর্তমান সমাজ-সংস্থিতির ব্যবস্থা চমকপ্রদ হলেও তার ভেতর কোন গভীর দৃষ্টির পরিচয় পাইনে।

কোন বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলতে হলে, আবশ্যক হয় তুটি উপাদান—যোগ্যতা ও সমতা। যোগ্যতা দেয় শক্তি, সমতা দেয় অখণ্ড দৃষ্টি ও শান্তি। যোগ্যতার দ্বারা মানুষ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে, এবং সর্বশক্তি প্রতিষ্ঠিত করে প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারে। সমদৃষ্টি না থাকলে যোগ্যতা ক্লেশেরই কারণ হয় এবং যে স্বচ্ছ ব্যাপক দৃষ্টির আবশ্যক হয় কোন গঠন-কার্যে, অনেক সময় তার অভাব হয়।

যোগ্যতা মানুষকে সাধারণ স্থিতি অপেক্ষা উচ্চতর স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত করে কিন্তু তা তুঃখের ও অত্যাচারের কারণ হয় যদি সে যোগ্যতার সঙ্গে না থাকে সমদৃষ্টি। সমদৃষ্টি দেয় হৃদয়ের ব্যাপকতা, যোগ্যতা দেয় শক্তি। সমদৃষ্টির সঙ্গে যোগ্যতার সংমিশ্রণে প্রকৃত আদর্শের সৃষ্টি। কি ব্যক্তিগত, কি সমাজগত জীবনে এ তুয়েরই আবশ্যকতা বেশী, একটির অভাবে সমাজ পুষ্ট হতে পারে না। বর্তমান সভ্যতা এই সমদৃষ্টিহীন হওয়াতে তার হয়েছে যত বিপদের কারণ।

শক্তির রূপ জড় বা চেতন, তাঁর একটি দার্শনিক সার্থকতা থাকলেও জীবনের পক্ষে শক্তিবাদের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে জাতিকে সকল রকমে জীবিত ও স্ফূর্ত করা, প্রাণ ও বিজ্ঞান শক্তিকে জাগ্রত করে, জীবনের পূর্ণ বিকাশের পথ প্রস্তুত করা। এ বিষয়ে রাশিয়া ও জার্মাণী বা ইতালীর দৃষ্টি প্রায় একরূপ, কিন্তু শক্তিবাদের যে চরম পরিণতি, অতিমানববাদ, দার্শনিক সিদ্ধান্ত হিসাবে রাশিয়া তাকে স্বীকার করে নি। কিন্তু তার

রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে এরূপ এক অতিমানবের দ্বারা। রাশিয়ার মূলনীতি যে সাম্যবাদ (অর্থনৈতিক ও সামাজিক) তা জার্ম্মাণীতে ও ইতালীতে নেই। জগতে মানবমাত্রেরই সমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সমান সুখের অধিকার তাঁরা স্বীকার করেন না।

রাশিয়াতে মানুষের ধর্ম সম্বন্ধীয় পরিস্থিতি স্বীকৃত হয় না। তার কারণ এর মূলে মানুষের যে চিন্ময়-ব্যক্তিত্ব আছে তা গৃহীত হয় না। মানুষের অভিব্যক্তি, সমাজের অভ্যুদয়, সকলই সম্পন্ন হয় জড়শক্তির ও অর্থনৈতিক সংস্থানের দ্বারা। মানুষের কোন নৈতিক ও স্বাধীন কর্তৃক নেই। তার কর্মস্পৃহা ও শক্তি নির্ণীত হয়, বাইরের অবস্থার সমাবেশে ; অন্তঃকরণের কোন ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় নয়। মানুষকে এইভাবে অবস্থার দাস করা হয়েছে।

সমাজ সংস্থিতির কথা যাই হোক না কেন ইউরোপের এ সব সংস্থিতির ভেতর যে দৃষ্টি আছে তা শক্তির দৃষ্টি, এ দৃষ্টি দিয়েছে তার সংস্থিতির বিশেষত্ব। যে সমতা বা বৈষম্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান হচ্ছে তা শক্তিরই সমতা বা বৈষম্য। মানুষ প্রকৃতির বিবর্তনে উর্ধ্বতম বিকাশ। অধুনা পাশ্চাত্যে যাঁরা অধ্যাত্ম জীবনের সুষমায় আকৃষ্ট, তাঁরাও বলেন মানুষের ভেতর সহজ প্রবৃত্তিই (instinct) মানুষকে পরিচালিত করে। এরূপ সহজ জীবনের উর্ধ্ব বিকাশ আছে ; এই বিকাশ দেয় জীবনের ভেতর একটি স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ। কিন্তু এ বিকাশের মূল

প্রাণের সংবেগ এবং তার তৃপ্তি প্রধানতঃ প্রাণ স্তরে। অধুনা ইউরোপের কোন কোন মনীষী ধর্ম-জীবনের বিকাশ সম্বন্ধে এরূপ মতই প্রকাশ করছেন। এই অভিব্যক্তি প্রাকৃত হলেও তার ভেতর একটি নবীন ধারা প্রকাশিত হয়। সৃষ্টি ভিন্ন আর একটি অন্তর্মুখী গতি আছে। এ বরণ করে নেয় সত্যের দৃষ্টি এবং স্থিতি।

যাহক, মুক্তি সংকীর্ণতার অপসারণ। জীবনের ছন্দ সেখানে উন্মুক্ত এবং বিশ্বব্যাপী। বিশ্বছন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্বদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষই অনন্ত শান্তির আধার। জ্ঞানে এর প্রতিষ্ঠা, শান্তি ও ছন্দে এর প্রকাশ, শক্তি এর বিধৃতি। আত্মদৃষ্টি শক্তির মূলে। এই আত্মদৃষ্টি দেয় পরম সমতা; সত্তার পরিসরতা হতে হয় শক্তির উদ্বোধ। আত্মশক্তিই বিরাট শক্তি। এ শক্তি যেখানে পরিস্ফুট, সেখানে প্রজ্ঞা, মেধা, শ্রী, পূর্ণভাবে বিরাজিত। আধ্যাত্মিক যোগ্যতা দেয় আত্মদৃষ্টি। আত্মদৃষ্টিতে দিব্যশক্তির প্রতিষ্ঠা; সেখানে ইচ্ছা অপ্রতিহত, তার গতি বিশ্বকল্যাণে। জীবনের বিকাশের যতটা উর্ধ্বে স্থিতি, ততই প্রসারতার বৃদ্ধি। এজন্যেই উপনিষদে জ্ঞানী পুরুষের নানা ঐশ্বর্যের কথা আছে। ঐশ্বর্যশালী পুরুষ তাঁর জ্ঞান ও শক্তিতে পূর্ণ। শক্তি প্রয়োগ আবশ্যক হলে সমাজ-সংস্থিতি বিধানের জন্যে এরা অনায়াসে তার প্রয়োগ করেন। আবশ্যক হলেও অপ্রতিহত বিশ্ব কল্যাণ ভিন্ন এদের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ হয় না। ইচ্ছা নিত্য জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলেই এদের ইচ্ছা স্বার্থানুসন্ধানে প্রযুক্ত হয় না।

মানুষের জীবন শক্তির রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে। শক্তিই দেয় জীবনে সাবলীল গতি ও নানা স্ফূর্তি। শক্তির স্ফূর্তি জীবনকে করেছে নানা সম্পদে পূর্ণ। জীবন যখনই হারিয়ে ফেলে তার উন্মুক্ত ভাব, তখনই শক্তির সঞ্চার হয় সংকুচিত। শক্তি উন্মুক্ত বিধৃতিতে প্রতিষ্ঠিত। ক্ষুদ্রকে, অল্পকে অবলম্বন করে শক্তি ক্রিয়াশীল হয় না। এ উন্মুক্ত স্থিতি ভিন্ন শক্তির বিরাট রূপের বিকাশ হয় না। এ জন্যেই মুক্ত পুরুষ স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন, তাঁর স্থিতি ও গতি দুই-ই উন্মুক্ত। বিশ্বের কল্যাণে উদ্বুদ্ধ, তিনি বিশ্বাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত।

এ যোগ্যতার এবং সমতার সমন্বয় সাধন মানব সমাজে বিশেষ-রূপে আবশ্যক। কিরূপে এ সমন্বয় সাধন করতে হয় এবং কিরূপে এদের প্রয়োগ করতে হয় তাও উপনিষদে আমরা যেমন পাই অন্য কোথাও তেমন পাইনে। ছন্দ সূক্ষ্ম শক্তির স্ফুরণ করে। চিত্ত-ছন্দই সকল শক্তির মূলে। অন্তঃস্তরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, দিব্যশক্তিতে বিভূষিত করে। এমন কি বিশ্বশক্তির সাথে দেয় অভিন্নতা। এরূপ জাগরণ ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন করে। এ ব্রাহ্মী শক্তির স্পর্শে বিরাট ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ। কিন্তু এ শক্তির জাগরণে সমতা একটুও নষ্ট হয় না। শক্তি জ্ঞাননিষ্ঠ। দিব্য-শক্তির জাগরণে স্বরূপের অসীমের সাথে পরিচয়। অসীমবোধে প্রতিষ্ঠিত শক্তি বিশ্ব-কল্যাণে নিয়োজিত। আত্মস্থিত পুরুষই শক্তির পূর্ণ কেন্দ্র। এটা শুধু বিষয় হতে উপরতি নয়। এ বিষয়ের আকর্ষণ বিকর্ষণ হতে মুক্তি। এ মুক্তি হলেই আত্ম-রতি পুরুষ

আত্মক্রীড়া করে। কখনও জ্ঞান, ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে। কখনও সুন্দর ও শিবের ছন্দ, কল্যাণ ও সুষমায় প্রতিষ্ঠা করে।

বর্ত্তমান ভারত পাশ্চাত্য ভাবধারার সাথে পরিচিত হয়ে অগ্রগতির প্রতি আকৃষ্ট নবীন সমাজ-ব্যবস্থায় তৎপর। কর্মে ও সংগঠনে নবীন স্ফূর্তির আবশ্যকতা আছে কিন্তু তত্ত্বের উদ্দীপনাকে ও সাধনাকে বাদ দিয়ে নয়। প্রাণ শক্তির দৃঢ়তার ও নবীন সৃজন-স্পৃহার সঙ্গে নৈমিষারণ্যের ভাগবত ছন্দের পূর্ণ সংযোগ আবশ্যক। এ ছন্দ হারালে ভারত তার জীবন হারাবে। রজঃশক্তি সাত্ত্বিকী প্রভায় মণ্ডিত হলেই জয়শ্রী কর্মে, জ্ঞানে, আধ্যাত্মবিদ্যায় বিকশিত হবে। প্রাণের প্রেরণা, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, আধ্যাত্মিক প্রবণতার সমন্বয়ে পৃথিবীর কল্যাণ। উপনিষদের অখণ্ড জ্ঞানের আলোকে অখণ্ড মানব সংঘের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত প্রয়োজন। আত্মমুক্তি ও বিশ্বকল্যাণ ভারতের চির আচরিত ধর্ম। ভারতের সমাজের নেতৃত্ব করেছেন জ্ঞানদীপ্ত, প্রেমপুলকিত ত্যাগীরাই। এদের দৃষ্টান্তে ভারতের সামাজিক জীবন ছিল মহামানবতায় উদ্বুদ্ধ—ও মানব কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত।

উপনিষদের এ দৃষ্টি পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে রবীন্দ্রনাথের ভারত তীর্থের কল্পনা সত্য হবে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা এবং সত্যব্রত সিদ্ধ হয় একাত্ম অনুভূতির দীপ্তিতে। উপনিষদের যোগশক্তি প্রতিষ্ঠিত হলে ভারত শক্তির আধার ও আশ্রয় হবে। শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্ন, দিব্য মানব সংঘের হবে প্রতিষ্ঠা।

উপনিষদ বিদ্যা শুধু তত্ত্ব নির্ণয় করে না। সত্তার সব স্তরকে ছন্দোবদ্ধ করে তত্ত্বের প্রকাশ করে। উপনিষদে সমগ্র জীবনকে সঙ্গতিসম্পন্ন করবার কৌশল আছে—তত্ত্বদৃষ্টি এর লক্ষ্য। সঙ্গতি এ দৃষ্টি লাভ করবার উপায়। এ জন্যেই জ্ঞানের সঙ্গে যোগের গূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে। যোগ দেয় জীবনের শিল্প, সেই শিল্পে জীবন গঠিত হয়ে স্বচ্ছ বিকাশে পূর্ণ হয়। সত্য এতেই বিধৃত। জীবন যখন বিশ্ব-ছন্দে ধৃত তখন তত্ত্বের পরম দৃষ্টি।

স্বাধীন রাষ্ট্রে উপনিষদ

ভারত আজ স্বাধীন। রাষ্ট্র নেতারা ভারতের রাষ্ট্র রূপ কী হবে তা নিয়ে চিন্তা করেছেন। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল বলেছেন ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্র হবে পার্থিব রাষ্ট্র (secular state)। এর ভেতর কোন জাতির বা ব্যক্তির ধর্ম্মমত থাকবে না, মানবের অধিকার হবে সমান ; রাষ্ট্রীয় অধিকারে কোন বর্ণের, ধর্মের বিশেষ কিছু সুবিধা থাকবে না। পার্থিব অধিকার কোন অপার্থিব দৃষ্টি দ্বারা ব্যাহত হবে না এবং সর্বমানবের সমান অধিকার হবে। অতএব রাষ্ট্রের আদর্শ হবে পার্থিব জীবনকে পার্থিব শক্তিতে ও শ্রীতে সম্পন্ন করা। এটা স্বাভাবিক, কারণ ভারতবর্ষে এত ধর্ম্মমত বিদ্যমান যে অপার্থিব কিছুর দিক দৃষ্টি দিলে নানা মতভেদ হয়ে রাষ্ট্রকে চূর্ণ করে দিতে পারে।

কিন্তু কথাটা হচ্ছে পার্থিব ও অপার্থিবের সীমারেখা কোথায়

টানা হবে। সত্যি কী মানব জীবনে এরূপ বিভাগ সম্ভব? সমস্ত জগত আজ পার্থিব রাষ্ট্রের আদর্শে উদ্বোধিত। এর জন্য সমগ্র দৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছে—পার্থিবের ভেতর অপার্থিব ও ব্যাপকের সন্ধান না থাকলে, পার্থিব দৃষ্টির সংকীর্ণতার জন্য আদর্শ রাষ্ট্র গঠিত হতে পারবে না। অপার্থিব দৃষ্টি বলেই যে ধর্মান্ধতা উপস্থিত হবে, তার কোন কারণ নেই। যে অপার্থিবতার ভিত্তি উপনিষদের সর্বব্যাপক সত্ত্বা তাতে কোন সংকীর্ণ দৃষ্টি থাকতে পারে না। বরং সমষ্টি মানবে তার স্ফুর্তি অধিকতর। পার্থিব রাষ্ট্রের ভেতর সমতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা কঠিন; পার্থিব শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে বিকসিত হয়। শক্তি কেন্দ্রীভূত হলেই তার সংকোচ ও বিরোধ। বিভিন্ন রাষ্ট্রের দৃষ্টি একটি স্থানে এত উদার হওয়া আবশ্যক যে তারা অখণ্ড মানবতার সত্যিকার সন্ধান পাবে অখণ্ড সত্ত্বার ভেতর। খণ্ড দৃষ্টির বিলোপ না হলে সমষ্টি মানবের উজ্জ্বল বিকাশ সম্ভবপর নয়। অভিভক্তির ধারায় আজ সমস্ত মানব সমাজ ক্রমশঃ এক সঙ্গে মিলিত হইতেছে। এই ধারা অটুট থাকলে ক্রমশঃ তাহার অভ্যুদয় হবে বিশ্বমানবে। এই বিশ্বমানব বোধ যখন সকল রাষ্ট্রকে করবে চালিত, তখনই হবে বিশ্বশান্তি সংস্থাপন।

আজিও যে মানব সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অস্বস্তিবোধ তাহার কারণ হচ্ছে মানুষের ভিতর বিশ্বমানবের ছন্দ স্ফুট নয়। ভারতের স্বাধীনতার পথে এমন বিশৃঙ্খলা সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে ঐক্য জীবনের ছন্দ তো অনুভূত হচ্ছে না,

বরং নানাবিধ শৃঙ্খলাহীন শক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই হয়েছে চিন্তার বিষয়।

এইরূপ বিকাশ হয়তো স্বাভাবিক, কারণ উর্ধ্ব শক্তি অবতরণের পূর্বে অবচেতন হয় অধিকতর ক্রিয়াশীল। এই সময় এই অবচেতনের বিকাশে শঙ্কিত না হয়ে উর্ধ্ব মানস হতে উজ্জ্বল শক্তির আকর্ষণ করাই শ্রেয়ঃ। মানুষের অন্তরে এই শক্তির প্রবাহ চিরকাল আছে ও থাকবে। এই শক্তির সহিত পরিচিত হলে রাষ্ট্রনেতারা উদ্বুদ্ধ হবেন দিব্য প্রেরণায় ও দিব্য সৃষ্টিতে। শুধু ভারতে কেন, সমস্ত জগতে আজ এই প্রেরণা সম্যক দরকার হয়েছে। অশোকের সময় যা সম্ভব হয়েছিল তা আজ কেন অসম্ভব হবে। ইজিপ্ট-এ প্রিনস্ ইগনেটনের সময় এরূপ সমদৃষ্টি ও উর্ধ্বদৃষ্টির দ্বারা রাষ্ট্র-নায়কেরা পরিচালিত হতেন। বিশ্বের কল্যাণদৃষ্টি যখন রাষ্ট্র-পরিচালকদের অন্তরে আনবে দৃষ্টি ও শক্তি, তখন পার্থিব রাষ্ট্রেও অপার্থিব রাষ্ট্রের সন্ধান পাইবে। মানব জীবনে কি ব্যক্তিতে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে, এই অপার্থিব দৃষ্টি করে সমস্ত সমস্যার সিদ্ধান্ত। বিরোধের স্থানে হয় মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত, অকল্যাণের ভিতর হয় কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত, অসুন্দরের ভিতর হয় চিরসুন্দরের স্ফূর্তি। মানুষের ভুললে চলবে না যে জীবনের ভিত্তি কল্যাণে ও সৌন্দর্যে, এবং জীবনের গতি শিবে আর শান্তিতে।

বিশ্বের আজ বড় সমস্যা সমাজের আদর্শ নিয়ে। মানবত্বে উদ্বোধিত বিশ্ব মানবের কল্যাণ চায় সর্ববিধরূপে। মানুষে

মানুষের সত্যিকার সম্বন্ধ ও বন্ধন শিথিল হচ্ছে, মানুষের দৃষ্টি নেবে এসেছে স্বার্থে। মানুষ নিজের স্বার্থকেন্দ্র ত্যাগ করে ব্যাপক বুদ্ধি নিয়ে কল্যাণব্রতী হতে পাচ্ছে না। মানবত্বের বেদীতে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে সকল আবিলতার ভিতরে মানুষের নূতন মুক্তির পথ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছে। দার্শনিক Comte মানবের এই পূজা প্রথম প্রবর্তন করেন। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, শ্রীমোহিতলাল মজুমদার মহাশয়, 'অভয়ার কথা'র গ্রন্থ পরিচয়ে মানুষের অতিঅসহায় অবস্থা দেখিয়া মানুষের উদ্ধারের পথ পেয়েছেন প্রেমে। যে প্রেম আপামর সাধারণকে আলিঙ্গন করে সে প্রেম এখন জগতে আসেনি। এমন প্রেম তিনি চান যাহাতে নিখিল মানব—গোষ্ঠি উদ্ধার হবে। তিনি চান সেই প্রেম যাহা পাত্রাপাত্র ভেদ করবে না, যা আবাহনের অপেক্ষা রাখবে না। মানুষ এমন অবস্থায় নেবেছে যেখানে মানুষের কাছ থেকে কিছুই দাবি করা চলিবে না। প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়ে তিনি লিখেছেন: "যে মনুষ্যত্ব, যে দুর্বলতা মানুষের নিয়তি, আমি সর্বাগ্রে সেই মনুষ্যত্বকে স্বীকার করি। মানুষের সেই মনুষ্যত্ব থাকতেও সেই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় কি? আর কোন উপায় দেখি না। সে অপার কারুণ্য, সেই সমর্থ সর্ব-নিরপেক্ষ প্রেম ছাড়া।" কথাটী অতি সুন্দর, কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে এই প্রেম শক্তিমানেরই প্রেম। তার করুণা হবে মানবীয় করুণা। মানুষের মধ্যে এমন প্রেম উদ্ভব হতে পারে যে ব্যথার ব্যথী মানুষ হইতে পারে। ব্যথা আছে তাহার হৃদয়ে, ব্যথার ঔষধও তাহার হৃদয়ে।

তিনি এই বিশ্ববেদনা হতে মুক্তি চান না। লক্ষ কোটি প্রাণীর সাথে এক গতিই চান।

কিন্তু এই যে বিশ্বব্যথার অনুভূতি কি মানুষ মাত্রেরই আছে? অখণ্ড মানবত্ব—এর বোধ তো সর্বত্র স্ফুট নয়। কতখানি শুদ্ধি ও স্বচ্ছতা এলে মানুষের দৈন্য দুঃখ অনুভব সহজে হয় তাহা তো বোধিসত্ত্বের জীবনে পরিস্ফুট হয়েছে। দুঃখ হতে মুক্তির জন্য তিনি সংসারকে ত্যাগ করেছিলেন, সংসারের প্রতি অপার করুণায় তিনি নির্বাণ পথ ত্যাগ করে সংসারে নেবে এসেছিলেন এবং সমস্ত বিশ্বকে শান্তি দিতে চেয়েছিলেন। একমাত্র তত্ত্বসাক্ষাৎকারে এ সম্ভব। জগতের সকল আকুতি সকল বেদনা তিনি গ্রহণ করতে পারেন যিনি সত্যের তেজোময় মূর্তি দর্শন করেছেন। মানবত্বের ভিতর এরূপ তেজোময় সত্যের সন্ধান যিনি পেয়েছেন তার পক্ষেই কল্যাণের পথ মুক্ত। তিনি বিশ্বকল্যাণে উদ্বোধিত, তিনি অসামান্য শক্তিবিশিষ্ট। এই সত্য উদ্বোধিত না হলে অন্তরের সংশয় ঘোচে না এবং পরমা ধৃতির উদ্বোধন হয় না।

কারুণ্য—বিশ্বকারুণ্য বোধিসত্ত্বের চিত্তে উদ্ভব হওয়া সম্ভব। চিত্ত যেখানে সকল মলিনতাশূন্য, সকল স্বার্থ উন্মুক্ত, বিরাটের ছন্দে উদ্বুদ্ধ, সেখানে এই অপার্থিব কারুণ্যের স্ফূর্তি হয়। অন্যত্র নহে। কারুণ্য যে জগতের উদ্ধারের কারণ তার কোনও সন্দেহ নাই। কি সে করুণা! গঙ্গার স্রোতের ন্যায় পরম জ্ঞানীর ব্যাপক হৃদয় হতে নিসৃত হয়।

বিশ্বের সকল দ্বন্দ্বের শেষ হবে না, যদি অভিব্যক্তিতে মানুষের সমষ্টিগত জীবনে এক সত্তার স্ফূর্তি না হয়। যে মোহের আবরণ আজ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে সে আবরণ অপসারিত করতে হলে, অপহতপাপ্ম ব্রহ্মলোক হতে জীবনের ধারা অবতরণ করিয়ে সমস্ত মানব সমাজকে শান্তির স্নিগ্ধতা ও কল্যাণের ব্যাপকতায় পূর্ণ করতে হবে। সঙ্কুচিত জীবনের মধ্যে সম্প্রসারিত জীবনের ছন্দ জাগিয়ে তুলতে হবে। উপনিষদ সেই সম্প্রসারণের কথাই বলেছে। এইজন্য উপনিষদ বিদ্যার আজকের দিনেও বিশেষ আবশ্যকতা ও কার্যকারিতা আছে।

মানুষের সভ্যতার ভিত্তি, আজিও প্রাণ স্তরে। সভ্যতার গতি মানুষের শক্তিও অভ্যুদয়ের ওপর নির্ভর করে। প্রাণের ব্যাপকতা, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য না আসলে, মানুষের বৃত্তি হবে ক্ষুদ্র। কোন মহাভাব মানুষকে আকর্ষণ করিবে না। প্রাণের ছন্দ বিশ্ব-বিজ্ঞানের স্বচ্ছ প্রকাশে চিত্তকে ক্রমশঃ ঈশ্বরের ভাবে পূর্ণ করে, এবং বিশ্বময় স্বচ্ছত ও ঈশ্বরীয় ভাব ও প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করে। মানুষ এ ভাবে ক্রমশঃ বিশ্বছন্দে জাগ্রত হয়ে বিশ্বমানবের সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাসী হয় ব্যাপক ভাব ও ছন্দে ধ্বনিত হয়ে এক বিরাট ছন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ব সর্ব সমস্যা এরূপ অবস্থার প্রাপ্তিতে মীমাংসিত হয়ে যায়।